জলভ্রমি

সতীনাথ ভাদুড়ী

বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬৯

প্রকাশক

স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য

৩৩ কলেজ রো

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

বাদল রায়

বিদ্যাসাগর প্রেস

১৯ গোয়াবাগান

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট শিল্পী

কানাই পাল

দাম : তিন টাকা

সূচীপত্র

॥ মহিলা-ইন্‌-চার্জ ॥

অসম্ভব ভিড় ঘাটের গাড়ীতে। আসাম থেকে সাঁওতাল কুলিরা বাড়ী ফিরছে। তাদের লাঠি, বস্তা, ভার বইবার বাঁক ইত্যাদি অজস্র জানা-অজানা জিনিসের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে, অতিকষ্টে বাঙ্কের উপর পা ঝুলিয়ে বসবার জায়গা করে নিয়েছি। চোখের উপর আবার এক আলো। খুব পোকা উড়ছে। বাঙ্কের উপর বসবার জায়গা পেয়ে ভেবেছিলাম তিন ঘণ্টার মত নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে, কিন্তু যা ভাবা যায় তা কি হবার জো আছে এ পৃথিবীতে। পোকাগুলো এক মিনিটের জন্যও নিশ্চিন্ত হতে দিচ্ছে না। জামা কাপড়ের বাইরের দিকটা এদের কেন যে অপছন্দ, বুঝি না! এসবের উপর আবার আছে শালপাতার বিড়ির দম-আটকানো ধোঁয়া। ধোঁয়া চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়ে না বেরিয়ে ছাতের দিকে কেন ওঠে তার বৈজ্ঞানিক কারণটা ভেবে মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছি; এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল। আমার ঠিক নীচে বেঞ্চের উপর যে সাঁওতাল স্ত্রীলোকটি বসেছে সে-ই শালপাতার বিড়ি খাচ্ছে। বিড়িতে টান মারবার পর, ঘাড় উলটে, মুখ বাঙ্কের দিকে তুলে, ঠোঁট ছুঁচালো করে, ধোঁয়ার পিচকারি ছাড়ছে আমার দিকে লক্ষ্য করে; আর অন্য কার দিকে চেয়ে যেন দুষ্টুমির হাসি হাসছে. আমি দেখছি বাঙ্কের কাঠের ফাঁক দিয়ে। তাই বুঝতে পারলাম না অপর ব্যক্তিটিকে। তবে এরা যে ইচ্ছা করে আমাকে জ্বালাতন করছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। কিছু বলবার সময় পেলাম না। তাকে তাকে থাকলাম, হাতেনাতে ধরবার জন্য। যথা সময়ে নীচের সাঁওতালনীটা আমার বাঙ্কের দিকে আর একদফা ধোঁয়া ছাড়তেই তাড়া দিয়ে উঠি—"অ্যায়! ও কি হচ্ছে!"

ভয় পেয়ে গিয়েছে স্ত্রীলোকটি।

বেঞ্চের অন্যদিক থেকে একজন শিখিয়ে দিল তাকে কথাটির কি জবাব দিতে হবে।

"বল—কাঁচা প্যাসেঞ্জারকে ধোঁয়া দিয়ে পাকানো হচ্ছে।"

"চোপ রও! মুখ সামলে কথা বলবে!"

মাথা গরম হয়ে উঠেছে আমার। ধমক দেবার সময় বাঙ্কের থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে, সেই ফাজিল লোকটাকে খুঁজে বার করতেই হল। কম্পার্টমেণ্টের ওদিকটার সবাই সাঁওতাল-সাঁওতালনী—কেবল ওই লোকটি বাদে। মাথা কামানোব পাচ সাত দিন পরে যেমন হয়, সেইরকম ছোট ছোট করে মাথার কাঁচা-পাকা-মেশানো চুলগুলো ছাঁটা। গোঁফ-দাড়ি এত পরিষ্কার করে কামানো যে মনে হয় এর আগের জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নাপিতকে দিয়ে, এ কর্ম সমাধা করা হয়েছে। বেশ মেদ-বহুল চেহারাটি। প্রথম দর্শনেই কেন যেন মোগল অন্তঃপুরের দ্বাররক্ষীদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। পাকা চুল না দেখলে এর বয়সের আন্দাজ পাওয়া শক্ত হত। লোকটা খয়নি ডলছে। ওর গায়ের উপর হেলান দিয়ে একটি সাঁওতালনী ঘমচ্ছে। সাঁওতাল নয়, অথচ ওযে সাঁওতালদের দলের মধ্যের একজন, একথা লোকটির ভাবভঙ্গী দেখেই বোঝা যায়। পথে হঠাৎ দেখা হওয়া যাত্রীর সঙ্গে এরকমের অন্তরঙ্গতা সম্ভব নয়—বিশেষ করে সাঁওতালদের। চেনা চেনা লাগছে মুখখানা।

"বাঙ্কের থেকে ঝোলানো পা দুখানা কেটে না নিয়ে, ওতে যে ধোঁয়া দিচ্ছে এই আপনার ভাগ্যি। আসুন। খয়নি চলবে আপনার?"

চোখ মুখে বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের সহাস ভঙ্গী। গায়ে হেলান-দেওয়া ঘুমন্ত সাঁওতাল মেয়েটিকে কান ধরে টেনে সরিয়ে, সে খয়নিভরা হাতটা এগিয়ে দিল আমার দিকে।

সেই মুহূর্তে তাকে চিনেছি।

তাচ্ছিল্য দেখাবার এই ভঙ্গী আমার অতি পরিচিত। একটি রাজনৈতিক পার্টির অফিসে তখন আমরা থাকি। একবার একজন বড় নেতা এসেছিলেন আমাদের অফিস ইনসপেকশন করবার জন্য। নিজের কাজ আরম্ভ করবার আগেই নেতাসুলভস্বরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—'গ্রামে এত কাজ। আপনারা করেন কি অফিসে বসে বসে?'

ও তখন সম্মুখে বসে খয়নি ডলছিল। ঠিক এইরকম তাচ্ছিল্যভরা হাসি মুখে এনে ও জবাব দিয়েছিল—করি মোহন্তগিরি। আপনিও মঠের মোহন্ত, আমরাও

মঠের মোহন্ত। অন্ধ ভক্ত, যজমান এনে দেয় চাল-কলা ; তাই লুটেপুটে তো খাওয়া ! এই নিন ! আসুন ! ও আপনারা বুঝি ধোঁয়াপ্রেমী লোক—খয়নি চলে না ? কিন্তু যাই বলুন—'লীডারজী, এ শালা তামাকের নেশার যতই রকমফের করুন, ইনি কিছুতেই দেহের মধ্যে টেকেন না। এঁকে বার করে দিতেই হবে। সিগারেট, তামাক খান, ধোঁয়া বার করতে হবে ; জরদা, দোক্তা, খয়নি খান, থুতু ফেলতে হবে ; নস্যি নেন, নাক ঝাড়তে হবে।' বলে হাসতে হাসতে এক টিপ খয়নি ঠোঁটের নীচে পুরেছিল।

এই ছিল ওর ধরণ। ওকে চিনতে কি কখন ভুল হয়।

"ও তুমি ! নাটোয়ার লাল ! কোত্থেকে ? কোথায় আজকাল ? কোথায় যাচ্ছ ?"

"ও আপনি ! বলতে হয়।"

সে হেসেই আকুল। হাসির দমকে ভুঁড়ির উপর ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

যার সেকালের প্রাত্যহিক জীবনের বিবরণগুলো আজও আমাদের রসের খোরাক জোগায়, সেই সব পুরনো অতিকথার রহস্যময় নায়ক আজ সশরীরে আমার সম্মুখে। সেকালে প্রত্যহ ওকে আমি ঈর্ষা করেছি ; আজও করলাম।

"নাটোয়ার তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল বিশ বছরের উপর হবে, না ?"

সে আমার কথার জবাব দিল না। সাঁওতালনীটার চোখের ঘুমের ঘোর এখনও যায়নি। ঢলে ঢলে পড়ছে তার গায়ের উপর।

"ছ্যাখ একবার এর কাণ্ড !" বলে নাটোয়ার সাঁওতালনীটার কনুইয়ের উপরটা খাবল মেরে ধরে বেশ করে ঝাঁকিয়ে দিল।

এই হচ্ছে চিরকালের পরিচিত নাটোয়ার লাল। সকলেই তাকে বিশ্বাস পায়। সাঁওতাল পুরুষরা সুদ্ধ তার আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করছে না।

তার সে ক্ষমতা দেখছি এখনও আছে। সেকালে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিশবার তার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে আমরা অবাক হতাম। হাবভাবের ধরণ ছিল তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। কান ধরে টেনে, হত কথাবার্তার আরম্ভ। তারপর গল্প করবার সময় মধ্যে মধ্যে কনুইয়ের উপরের দিকে হাতের কোন অংশ খামচে ধরত। কথাবার্তার বেশীরভাগই ইতর রসিকতা এবং কথার সুর ছিল বিদ্রূপের। মজা হচ্ছে, যে বয়স নির্বিশেষে মেয়েরা তার এই ভাবভঙ্গী পছন্দ

করত, আর পারলে পরেই পাল্টা জবাব দিত, তার গোঁফ আর ভুঁড়ি খামচে ধরে। উভয় পক্ষেরই সহজ সপ্রতিভ ভাব। মেয়েরা কখন নাটোয়ারকে দেখে লজ্জা বোধ করেনি। আর নাটোয়ারের মনেও কোনদিন দ্বিধা কুণ্ঠার স্থান ছিল না। সব চেয়ে আশ্চর্য যে, মেয়েদের স্বামী পুত্রদের কোনদিন এর জন্য বিরক্ত হতে দেখিনি। অবশ্য আমি বলছি সাধারণ স্তরের মানুষদের কথা। সে নিজে লেখাপড়া শেখেনি; তার গতিবিধিও ছিল গরীব চাষী মজুর পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা নিত্য দেখতাম, মেয়েরা বিনা পয়সায় অফিস কম্পাউণ্ডের চোরকাঁটা পরিষ্কার করতে, বা দেয়ালে মাটি লেপতে আসত, শুধু তার সঙ্গে একটু ফষ্টি নষ্টি করবার লোভে।

শুধু যে পূর্বপরিচিতা স্ত্রীলোকদের উপরই তার প্রভাব খাটত তা নয়। একবার মনে আছে, 'ইলেকশান'এর মরসুমে আমরা এমন একটা বাজারে পৌছেছিলাম, যেখানে সাম্প্রদায়িকতার কল্যাণে আমাদের খেতে দেবার মত একজনও লোক ছিল না। আমাদের হাতে সেদিন পয়সা নাই, আতিথেয়তার সম্ভাবনার উপর নির্ভর করেই আমরা বেরিয়েছিলাম। বাজারের বাইরের তাঁবুর বাসিন্দা এক রূপোপজীবিনীর কাছ থেকে নিজের পদ্ধতি প্রয়োগ করে, নাটোয়ারলাল একটা টাকা আদায় করেছিল, আমাদের খাওয়ার জন্য। কি বলেছিল শুনিনি, তবে হাসতে হাসতে প্রথম সম্ভাষণ করে যে তার কানটা ধরে নেড়ে দিয়েছিল, তা' আমরা একটু দূর থেকে স্বচক্ষে দেখেছিলাম। সেদিনও ওর উপর হিংসা হয়েছিল।

কোন্ গুণে স্ত্রীলোকেরা তাকে ভালবাসত ও এমন নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করত, সে কথা আমি কোনদিনই ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে নাটোয়ারলালকে জিজ্ঞাসা করলে সে হাসতে হাসতে বলত,—কান মললেই দেখবেন ওদের মন গলবে।'

সাঁওতালদের সঙ্গে একটা কি যেন রসিকতা করে, এখনও হাসছে নাটোয়ারলাল।

জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন আছ কোথায়?"

"চা-বাগানে। এদের সঙ্গে। নীলজানি টি এস্টেট।"

"মজদুর মোর্চায়?"

জোরে জোরে হাসতে হাসতে সে বলল—"হ্যাঁ—শ্রমিক সেবা। পৃথিবী-সুদ্ধ কোটি কোটি লোক অষ্টপ্রহর সেবা করে চলেছে অপরের।"

আঙুল দিয়ে নিজের ভুঁড়িটা দেখিয়ে দিল সে।

"ওখানে চলছে ত বেশ?"

"আপনাদের আশীর্বাদে।"

"কান মলে এদের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করছ তো?"

"সে দরকার হয় না। এদের মধ্যে থাকি বলে, কোম্পানি দরকার পড়লে কিছু কিছু দেয়। মজদুর মোর্চা বাবা—ছেলে খেলা নয়!"

তার হাসির গমক গাড়ীসুদ্ধ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। শ্রমিক-সেবার কাজ করে, অথচ কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নেয়, এ সংবাদে আমি বিস্মিত হইনি। কেন না এসব বিষয়ে তার নীতিবোধ কোনদিনই বিশেষ ছিল না। পার্টি অফিসে থাকবার সময়ও দেশের রাজনীতি নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায়নি। একবার মনে আছে একটা সেফটিরেজর নিয়ে ঝগড়া হবার পর সে কিছুদিনের জন্য চলে গিয়েছিল অন্য একটা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিক দলে।

একজন সাঁওতাল বলল "সাহেব ম্যানেজার নাটোয়ারলালকে খুব ভালবাসে। এবার ওকে একটা লম্বা-কোট করিয়ে দিয়েছে। গরম কোট।"

"ওভারকোট?"

নাটোয়ারলাল হেসে স্বীকার করে "হ্যাঁ।"

সেকালে প্রতি 'ইলেকশান'এর সময় ধনীপদপ্রার্থীদের কাছ থেকে সে একটা করে গরম ওভারকোট আদায় করত। বছরের মধ্যে পাঁচ মাস সেই ওভারকোটটা চব্বিশ ঘণ্টা পরে থাকত। সেই জামা গায়ে দিয়ে, হাতে একখানা পুলিসের ছড়ি নিয়ে, সে সকালে বেড়াতে বার হত। আমরা বলতাম ট্যাক্স আদায় করতে বেরিয়েছে। কোনদিন কাগজিলেবু, কোনদিন আতা, কোনদিন তামাকপাতা, কোনদিন পেয়ারা, একটা না একটা কিছু সে প্রত্যহ আদায় করে আনত মেয়েদের কাছ থেকে। পয়সা নেবার অপবাদও মধ্যে মধ্যে কানে এসেছে।

একটি সাঁওতাল স্ত্রীলোক বলল—"মেম সাহেবই সাহেবকে বলেছিল ওর গরম জামা তয়ের করিয়ে দেবার কথা।"

"তাই নাকি ?"

আমার সঙ্গে সঙ্গে নাটোয়ারলালও হাসছে।

"নাটোয়ার, মেমসাহেবগুলোর কান ঠাণ্ডা না গরম হয় রে ?"

"জানবার স্থযোগ হয়নি আজও।"

কথার ইঙ্গিতটুকু ধরতে না পেরেও সাঁওতালরা আমাদের হাসিতে যোগ দিয়েছে।

"মনে আছে সেই একুশ বছর আগে—"

আমাকে কথা শেষ না কবতে দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে—'আপনি কি আজকাল কয়লাখনির মজুরদের মধ্যে কাজ করেন ?'

"না তো। তোমার এ ধারণা হল কোথা থেকে ?"

"আপনার গায়ের রঙটা দেখছি আজকাল একেবাবে কয়লার মত কালো হয়ে গিয়েছে কি না, তাই মনে হল।"

হাসির দমকে তার ভুঁড়ি কাঁপছে। তার সঙ্গিনীরাও না বুঝে হাসছে।

"বেশ আছ তুমি নাটোয়ারলাল।"

"ছিলাম তো বেশ ; কিন্তু এই ঢলানী মেয়েটা আর থাকতে দিচ্ছে কই।"

ঘুমকাতরে সাঁওতাল মেয়েটাকে সে কান ধরে সোজা করে বসিয়ে দিল।

"মনে আছে নাটোয়ার সে-ই….. "

নাটোয়ার হঠাৎ মেয়েটার কনুই-এর উপরটা ধরে দাঁড করিয়ে দিল—"ঘুমচ্ছে ! যা, বাবুর পায়ে প্রণাম করে আয়। বডকা লীডার।" শুধু মেয়েটা নয়, সব সাঁওতালরাই আমাকে প্রণাম করল একজন বড নেতা ভেবে।

"আচ্ছা নাটোয়ার, তুমি কি চা-বাগানের মজত্বর-মোর্চার মহিলা-ইনচার্জ নাকি ?" সে হো হো করে হেসে ওঠে। মাথা নাডিয়ে সে জানাল যে আমি ধরেছি ঠিক। আমরা কথা বলছি একুশ বছর আগেকার আমাদের মধ্যের সাঙ্কেতিক ভাষায়। সাঁওতালরা সে ভাষা বুঝবে কি করে।

সেকালে রাজনীতি ক্ষেত্রে মহিলা কর্মীর অভাব ছিল। অথচ গরীব শ্রেণীর লোকের মধ্যের নানারকমের স্ত্রীলোকঘটিত 'কেস' সালিসীর জন্য প্রত্যহ আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ত। এগুলো আরও বেশী আসত, লোকজনের সঙ্গে

নাটোয়ারলালের পরিচয়ের ফলে। ওই সব বিষয়ে তার উৎসাহ ছিল প্রচুর। বিকালে ওভারকোট পরে ট্যাক্স আদায় করবার সময় ওইসব সংক্রান্ত বহু-রকমের খুচরা খবরও মেয়েদের কাছ থেকে যোগাড় করে নিয়ে আসত সে। সাধারণ গরীব লোকদের মধ্যে তার খাতির ছিল খুব ; তাই সবাই তাকে সালিস মানতে রাজী। কাজেই আপনা থেকে এসব কাজের ভার এসে পড়ত তার উপর। শেষকালে একদিন আমরা সবাই মিলে ওকে স্থানীয় পার্টির মহিলা বিভাগ ইনচার্জ করে দিলাম। সকলে সংক্ষেপে ওকে বলত মহিলা-ইনচার্জ। ও খুব খুশী এই নামে। মহিলা-ইনচার্জ পদে বহাল হবার দিন আমরা সবাই ঘটা করে বালতি বাজিয়ে ওঁর গোঁফজোড়া কামিয়ে দিলাম। তারপর থেকে ও দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের বিভাগের কাজ আরম্ভ করে দিল। সত্যিকারের আনন্দও পেত স্ত্রীলোকঘটিত কেসগুলোর নিষ্পত্তি করতে পেরে। নিষ্পত্তি করবার পদ্ধতিও ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। পুরুষ ও স্ত্রী তুটোকেই প্রথমে এক দফা বেশ করে চাবকে, তারপর আবশ্যক কথাবার্তা আরম্ভ করত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গরমিলের কেস হলে প্রাথমিক প্রহারের পর তুইজনকে এক-সঙ্গে ঘরে বন্ধ করে রাখত। তুইজনেই বলবে মিল হয়ে গিয়েছে, তবে দরজা খোলা হবে। মামলা নিষ্পত্তির এইসব পদ্ধতিকে আমরা বলতাম 'ডিরেক্ট অ্যাকশন' পদ্ধতি। তবে সাধারণ হালকা অপরাধে, অপরাধিনীর কান ধরে ভুঁড়িতে ঢেউ খেলিয়ে হেসে বিদ্রূপ বাণ ছাড়লেই দেখা গিয়েছে কাজ হ'ত—বিশেষ করে 'মেলা ডিউটি'তে রূপাজীবাদের মধ্যে।

"তা এখন নীলজানি টি এস্টেটের মহিলা-ইন-চাজ চলেছেন কোথায় ?'

'এরা বাড়ী ফেরবার সময় প্রত্যেক বছরই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। মহিলা-ইন-চার্জ কি যে সে লোক—মহামান্য অতিথি। এদের আবার ভালয় ভালয় চা-বাগানে নিয়ে গিয়ে পৌছতে পারলে, সাহেব কিছু কিছু দেয় আমাকে।'

আবার সেই হাসি।

'কতরকমেরই যে কাজ আছে শ্রমিকসেবার মধ্যে।'

'হ্যাঁ—সব সেবার মধ্যেই।'

এক মিনিটের জন্যও সে হাসি থামায় নি।

'মনে আছে নাটোয়ার লাল, সেই যে……'

'আপনি সর দুধ খুব খান বুঝি ?'

'না। হঠাৎ ওকথা মনে পড়ল কেন ?'

'আপনার গোঁফ-জোড়া দেখে। সর-ঘি না লাগলে তো অমন তেল কুচকুচে গোঁফ হয় না।'

'কোত্থেকে পাব দুধ ? বিনা পয়সায় জুটলে তবে আমরা খেতে পারি। সে পেতে তুমি।'

সে যুগে অফিসের হোটেলে ঠাকুরের সঙ্গে 'কণ্ট্র্যাক্ট' ছিল—ভাত, ডাল, আর দুটো তরকারির। একমাত্র ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিল নাটোয়ারলাল। কাঞ্চী গয়লানী তাকে এক পোয়া করে দুধ দিয়ে যেত। এই দুধ দেওয়া-নেওয়া নিয়ে প্রত্যহ একটা অভিনয় চলত। কাঞ্চী প্রত্যহ দামের জন্য তাগিদ করত; আর নাটোয়ার দুধের দাম হিসাবে গয়লানীর কলসীর মধ্যে এক পোয়া জল ঢেলে দিতে চাইত। এই নিয়ে প্রত্যহ এক দফা রাগারাগি, ঝগড়া-ঝাঁটির পালা চলত। কোন রকমের গালাগালি বাদ পড়ত না। নাটোয়ার কাঞ্চীর কান ধবে টানত আর হাতের উপরটা খামচে ধরত। কাঞ্চী হয় খাবল মেরে ধরত ওর ভুঁড়িটা, না হয় সেটাকে দু হাত দিয়ে বেশ করে নাড়িয়ে নাড়িয়ে দিত, মাছের পোনার হাঁড়িব মত করে। পরের দিনও আবার যথাসময়ে সে দুধ নিয়ে এসে ডাকত—'কোথায় নাটোয়ারলাল !'

আমরা হিংসেয় ফেটে মরতাম।

'কাঞ্চী গয়লানী বেঁচে আছে এখনও ?'

এই প্রথম নাটোয়ারের হাসি থেমেছে। একটু যেন আনমনা হয়ে পড়েছে।

'হ্যাঁ। সে এখন বুড়ি থুড়থুড়ী হয়ে পড়ছে। আর পারে না, বাড়ী বাড়ী দুধ দিতে যেতে। কখনো দেখা হলে আজও তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। তার ওখানেই তো তোমার স্ত্রী আর…'

সে হঠাৎ লোটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল আমার কথা শেষ হবার আগেই। লোক ডিঙ্গিয়ে, ঠেলাঠেলি করে, সে গিয়ে পৌঁছেছে বাথরুমের কাছে। বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বিরক্তির ছাপ পড়েছে তার চোখ-

মুখে। ট্রেণের গতি কমেছে। একটা ছোট ষ্টেশন এসে গেল। নাটোয়ার গাড়ী থেকে নেমে পড়ল লোটা নিয়ে। গাড়ী সুদ্ধ সকলের নজর তার উপর। জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে তারা দেখছে। ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা দিল। অন্য কামরায় ওঠবার চেষ্টা করছে নাটোয়ার লাল। ভিড়। পাদানেও লোক রয়েছে দাঁড়িয়ে। প্রতি কামরায় সে বোধহয় একবার করে উঠতে চেষ্টা করল। হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে সাঁওতাল পুরুষরা। মেয়েদের মধ্যে অনেকে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করল। লোটা শুদ্ধ হাত তুলে কি যেন ইশারা করছে নাটোয়ার লাল। বোধহয় বলছে, ভাবিস না—আমি পরের গাড়ীতে আসছি।

আর কেউ বুঝতে পারেনি। আমি জানি যে সে ইচ্ছা করেই এ ট্রেনে গেল না। তার লোটা নিয়ে ওঠবার মুহূর্তেই, আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে সে আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না। দেখা হবার প্রথম থেকে, আমি যতবার আমাদের ওখানকার কথা পাড়তে চেয়েছি, ততবার সে কথা পালটাতে চেষ্টা করেছে।

জীবনে মাত্র একদিন আমি তাকে ঈর্ষা করিনি। সেইদিনকার কথাটাই ও এড়িয়ে যেতে চায়।

…তখন মহিলা-ইন-চার্জ নিজের পসার-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ শিখরে। দোর্দণ্ডপ্রতাপে ওভার কোট পরে ছড়ি নিয়ে নিজের রাজ্যপাট চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের অফিসের কাছের রাজ-মিস্ত্রী টোলার কয়েকজন স্ত্রীলোক 'মহিলা-ইনচার্জ'এর ভুঁড়িতে চিমটি কেটে একদিন নালিশ' জানাল যে পুলিশ কনষ্টেবলরা রাত্রিতে টহল দিতে বেরিয়ে অমুক মিস্ত্রীর বাড়ীতে আড্ডা গাড়ছে কয়েকদিন থেকে। দ্বারভাঙ্গা থেকে নতুন এসে ও মিস্ত্রী এখানে ঘর তুলেছে দিন কয়েক আগে। সামাজিক নিয়ম মানে না; পাড়ার আদব-কায়দা জানে না; বললেও গায়ে মাখে না। কোথা থেকে একটা মেয়ে মানুষকে নিয়ে এসেছে তিনচার দিন হল। বলে তো যে তাকে বিয়ে করবে। ওখানে পুলিশদের রাতের আড্ডা ওই জন্যই। তোর মত দারোগা পাড়ায় থাকতে, পাড়া-পড়শীর এই হাল হবে নাটোয়ার? মান-ইজ্জত তো আর থাকে না।

শুনেই খেপে উঠেছে মহিলা-ইন-চার্জ। কি! এত বড় আস্পর্ধা! তার নাকের উপর এই কাণ্ড! পাড়ার মধ্যে এত বড় বেয়াদবি সহ্য করবার পাত্র নাটোযার লাল নয়! এখনই যা! ধরে নিয়ে আয়! দুটোকেই একসঙ্গে! আজ ওদের হাড় আব মাস আলাদা করব! ভাবে কি ওরা!

ধরে আনতে বলায় ওরা সত্যিই কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে আনল। এমনিতে নাকি আসছিল না। কাঙ্গন ছাঁটছিল দ্বারভাঙ্গার মিস্ত্রী। বলে নাটোয়ার লাল ডাকবার কে? ও কি দারোগা? দেখ এইবার! দারোগা না দারোগার বাপ। পুলিশ চৌকিদাররা ওর বাড়ীতে রাত কাটায় কিনা, তাই এত বুকের পাটা।··

তুমুল কোলাহলের মধ্যে বাজমিস্ত্রী টোলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার শোভা-যাত্রা অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে আসে। যেন রাজ্য জয় করে ফিরছে। মেয়ে আসামীটির মাথায় লম্বা ঘোমটা টানা।

অফিস বারান্দায় উঠতেই ছড়ি নিয়ে গালাগালি দিতে দিতে এগিয়ে গিয়েছে মহিলা-ইন-চার্জ 'ডিরেক্ট অ্যাকশন'এর জন্য।

কিন্তু এ কি? হঠাৎ অবগুণ্ঠনবতীব ঘোমটা ফাঁক হয়েছে। ওদের শ্রেণীর মান অনুযায়ী দেখতে সুশ্রী মেয়েমানুষটি।

থমকে দাঁড়িয়েছে মহিলা-ইন-চার্জ।

প্রাথমিক সঙ্কোচ কাটবার পর, এতক্ষণে মুখ খুলল স্ত্রীলোকটির।

···'মরদ! ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই। মোচ কামিয়ে দাবোগার বিবি হয়ে বসে আছেন চেয়াবে। এখানে পুলিশের উর্দি পরে ছড়ি হাতে করে মদ্দানি ফলাস, তবে বিয়ে কবা বউ-এর কাছে সাত বছরের মধ্যে যাস না কেন?'·

বন্যার স্রোতের মত গালির স্রোত বইছে। কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিখুঁত অঙ্গ-ভঙ্গীরও বিবাম নাই। কেউ তাকে থামতে বলছে না। 'মহিলা-ইনচার্জ' এর সম্বন্ধে সুনিপুণভাবে সাজানো, নূতন নূতন তথ্যে সমৃদ্ধ গালিগুলো কৌতূহলী শ্রোতার দল গিলছে। কখন থেকে যেন এদের মনে হতে আরম্ভ হয়েছে যে, মেয়েমানুষটা যা বলছে সব সত্যি। সত্যি না হলে এত ঝাঁজ! জানে তো তারা। যতই চোখা হ'ক মিথ্যা

গালিমন্দতে এ ধক থাকে না। চোখমুখ দেখ না! শুধু কি মেয়েমানুষটার মুখ-চোখ—যার বিরুদ্ধে বলছে তার চেহারা দেখ না, কি হয়ে গিয়েছে। তাকাতে পারছে না কারও দিকে নাটোয়ার লাল। ও কি মিছে গালাগাল সইবার লোক! মিথ্যা হলে এতক্ষণে টেনে জিভ ছিঁড়ে ফেলে দিত মেয়েমানুষটার। নাটোয়ার লালের স্বভাব যে এ রকম, সে কথা কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি! এত ভড়ং, এত শাসন সে সব কি শুধু অন্যের জন্য? নিজের জন্য অন্য নিয়ম? বিয়ে করা স্ত্রীর খোঁজ নেয় না সাত বছরের মধ্যে! আর এই মেয়েমানুষটা ওর বিয়ে করা স্ত্রী! বেচারীর কি দোষ!··· আর এই নাটোয়ার লালকেই আবার এঁরা মেয়েমানুষদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করে দিয়েছেন!

মন যত নাটোয়ারের উপর বিরূপ হয়, ততই এই স্ত্রীলোকটির উপর সকলের সহানুভূতি বাড়ে। নিজেদের অজানতে কখন থেকে যেন মিস্ত্রীটোলার লোকরা এই স্ত্রীলোকটির পক্ষ নিতে আরম্ভ করেছে। একজন এগিয়ে গিয়ে তার কোমরের দড়ি খুলে দিল। অন্য সকলে লজ্জিত হল—এতক্ষণ তাদের কারও একথা মনে পড়েনি ভেবে।

ক্রমেই দেখা গেল দর্শকরা আমাদেরও ছেড়ে কথা বলছে না। কে জানে এই সব মহাত্মাদের মধ্যে কে কি মূর্তি!···পাবলিকের পয়সায় ফুটানি ছাঁটে সব!···

আমরা তখন পালাতে পারলে বাঁচি। মামলা নিষ্পত্তির ভার উপস্থিত দর্শকরা নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছে ততক্ষণে। দ্বারভাঙ্গার মিস্ত্রীর অপরাধ অতি তুচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের চোখে। স্ত্রীর বিচ্যুতির সমস্ত দোষ নাটোয়ার লালের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে এরা। মেয়েরাই খেপে উঠেছে বেশী। সামাজিক দায়িত্ববোধও জাগ্রত হয়ে উঠেছে। একটা কিছু এর বিহিত করতেই হয়।

হ্যাঁ, এখনই! মুহূর্তের দেরী করবার ধৈর্য নাই কারও এখন। মহিলা-ইন-চার্জ-এর নিজের নিয়ম অনুযায়ী তাকে এখন চাবকানো উচিত, কিন্তু এই গরমা-গরমির বাজারেও তাকে মারধর করতে বাধে, যদিও এই নীচ স্বার্থপর লোকটা তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তঞ্চকতা করে এসেছে এতদিন!

এতগুলি মন নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ না করেও একই সময়ে একই নির্ণয়ে পৌঁছেচে, ব্যাপারটার নিষ্পত্তি কেমনভাবে করতে হবে সে সম্বন্ধে। এখানকার কার্যপ্রণালী সকলকারই জানা।

মহিলা-ইন-চার্জ আর তাঁর বিবাহিতা স্ত্রীকে অফিসের একটা ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দিল তারা। চাবি রেখে দিল তাদের নিজেদের কাছে। যখন দুইজন মিলে বলবে যে তারা একসঙ্গে ঘর করবে ভবিষ্যতে, তখন খোলা হবে দরজা। যদি বলে, তাহলে মিস্ত্রীটোলার লোকরা ওদের দুজনের থাকবার জন্য চালা তুলে দিতে রাজী আছে। এখন বাছাধন মহিলা-ইন-চার্জগিরি ফলান্ বিয়েকরা বউ-এর উপর এই তালাবন্ধ ঘরে!

একজন টিন বাজিয়ে ঘোষণা করে দিল যে মহিলা-ইন-চার্জের অফিস এখন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। আর এই ঘরের আনাচে কানাচে কোন লোক ঘোরাঘুরি করলে, দরজায় আড়ি পাতলে বা জানলা দিয়ে উঁকি মারলে মিস্ত্রীটোলার দণ্ডবিধি অনুযায়ী কঠোরভাবে দণ্ডিত হবে। ···প্যারে ভাইয়োঁ। সাবধান!···

দ্বারভাঙ্গার মিস্ত্রী এই গোলমালে কখন সরে পড়েছে সেদিকে কারও খেয়াল নাই।

পরের দিন সকালে দেখা গেল জানলার কাঠের গরাদ ভেঙ্গে পালিয়েছে মহিলা-ইন-চার্জ। সেই যে পালিয়েছিল, আর ওমুখো হয় নি।

তারপর আজ একুশ বছর পরে নাটোয়ারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা ট্রেণে।

ও ভয় করছিল যে আমি এই দিনকার কথা বুঝি তুলব। তাই পালাল।

ভুল ভেবেছিল। বেচারা যে নিজের গল্পর সবটা জানে না। কাঞ্চী গয়লানী ওর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল নিজের বাড়ীতে। তখনও ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটা তুচ্ছ হাসি-ঠাট্টার বিষয় ছিল। নিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত আমরা বলেছি—"কাঞ্চী ভাল করে দেখতো মেয়ে-মানুষটার কান আছে কিনা; যা ঘোমটা দিয়ে থাকে!"

মাস কয়েক পর থেকে কাঞ্চী নাটোয়ারের স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে

এসে, কান্নাকাটি আরম্ভ করে আমাদের কাছে। কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় ব্যাপারটা। দ্বারভাঙ্গার মিস্ত্রীই জেতে। আইনের চোখে সাব্যস্ত হয় যে, সদ্যোজাত শিশুটি, স্ত্রীলোকটির বিবাহিত স্বামীর।

এই ছেলেটির কথাই আমি তুলতে চেয়েছিলাম নাটোয়ারলালের কাছে।

জনকয়েক সাঁওতালনী কাঁদছে। পৃথিবী-সুদ্ধ মেয়েরা যার জন্য কাঁদে, সে নিজের স্ত্রীর মন পেল না কেন জানি না! সাঁওতাল পুরুষরা আশ্বাস দিচ্ছে ক্রন্দনরতা মেয়েদের।

এই অবস্থাতেও আমার হিংসে হচ্ছে নাটোয়ারলালের উপর।

॥ কৃষ্ণকলি ॥

স্থরথবাবু চেয়ারে বসবার আগে এক বার জানালার দিকে তাকালেন। চা ঢালছিল রেখা কেটলি থেকে। বলল—'আসে নি।"

"বড় দেরী করতে আরম্ভ করেছে আজকাল!"

"হ্যাঁ।"

"অন্য লোক ঠিক করলেই হয়।"

"হ্যাঁ।"

ঝপ করে একটা শব্দ হল জানালার দিকে। স্থরথবাবু একবার কাশলেন। মনের চাঞ্চল্য ঢাকবার চেষ্টা করলেই তাঁর কাশি আসে। বাবার চায়ে দুধ তখনও দেওয়া হয় নি। রেখা ছুটল খবরের কাগজ আনতে। চা দেরি করে পেলেও চলবে, কিন্তু খবরের কাগজ পেতে দেরী হলে বাবা অধীর হয়ে পড়েন। তিন বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে, আজ চৌত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাবার জন্য জানালার কাছ থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসবার 'ডিউটি' তার। এ কাজে তার উৎসাহ দেখে ছোটবেলায় তাকে মা ঠাট্টা করে বলতেন—"দেখিস, তোর বিয়ে দেব, খবরের কাগজওয়ালার সঙ্গে।" এ কথায় রেখা ছিল খুব খুশী—কত খবরের কাগজ এনে দেবে বাবার জন্য—কত ছবিতে ভরা কাগজ—রাতদুপুরে 'টেলিগেরাপ্!' 'টেলিগেরাপ্!'—আরও কত কি।

বাবার কাগজ 'ইংলিশম্যান্; মেয়ের কাগজ 'দৈনন্দিন'। বহুকাল থেকে এই ব্যবস্থা। স্থরথবাবুর মতে তাঁর কাগজের খেলার খবর, পুস্তক সমালোচনা, সম্পাদকীয় ও বিজ্ঞাপনের মান, বাংলা কাগজের তুলনায় অনেক উঁচু। একথা রেখাও স্বীকার করে; তবে যে ধরণের সংবাদ পরিবেশন সে পছন্দ করে, সেটা বাংলা কাগজ না হলে পাওয়া যায় না। এর অর্থ এই নয় যে এক জনের কাগজ আর এক জনে পড়েন না। ইংরাজী কাগজখানা শেষ করবার পর, বাবা বাংলা কাগজখানা নেন; আর বাবার পড়া হয়ে যাবার পর মেয়ে 'ইংলিশম্যান'এ

হাত দিতে পায়। প্রত্যহ দুখানা কাগজই খুঁটিয়ে না পড়লে দু জনেরই মন খুঁতখুঁত করে। বাবা মেয়ে দুইজনকারই ধারণা যে প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তির দুখানা করে সংবাদপত্র পড়া উচিত; নইলে দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানে খুঁত থেকে যায়।

সুরথবাবু প্রথমে এক বার সব পাতাগুলো উলটে যান; তার পর আবার খুঁটিয়ে পড়তে আরম্ভ করেন প্রথম পাতা থেকে। এই তাঁর চিরাচরিত কাগজ পড়বার ধরন। অন্য দিন চায়ের টেবিলে সময় দেন মোটে পনরো মিনিট। আজ রবিবার; কোর্টের তাড়া নেই। এখানে বসে থাকতে পারেন নটা পর্যন্ত। দশটার ট্রেনে তাঁকে একবার নৈহাটি যেতে হবে এক মক্কেলের কাছে। খড় খড় করে কাগজের পাতা ওলটাবার শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কাগজের পাশ দিয়ে মেয়ের দিকে তিনি একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন। সে রুটিতে মাখন মাখাচ্ছে। কাগজ দিয়ে নিজের মুখখানাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে নিলেন সুরথবাবু; বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে কিনা রেখা। চেয়ার টেনে নেবার শব্দে বুঝতে পারলেন, রেখা এইবার বসল 'দৈনন্দিন' নিয়ে। সুরথবাবু খুলেছেন পুস্তক সমালোচনার পাতাটা। পড়ছেন।

"কুরূপা মেয়ে ও সমাজ। লেখক যাজ্ঞবল্ক্য।
ন্যায় প্রকাশনী। দাম ৮৲

এ বই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য। যাজ্ঞবল্ক্য ছদ্মনামে কে লিখেছেন সেকথা আমরা জানি না। তবে বইখানা পড়ে মনে হয় তিনি এক জন আইনজ্ঞ। বইয়ে তিনি এমন একটা সমস্যার কথা তুলেছেন, যার সর্বজনিকতা স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই আমাদের। মোটামুটি তিনি বলতে চান, যে জন্ম থেকেই কুরূপা মেয়েরা বিনাদোষে কতকগুলো অসুবিধায় ভোগে। ধরুন স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী-সভায় নৃত্যাভিনয় হবে। নাচগানের যোগ্যতায় অপেক্ষাকৃত নিরেস হলেও সুন্দরী মেয়েরা কুরূপাদের চেয়ে অগ্রাধিকার পায় এসব ক্ষেত্রে। দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপনে সুদন্তী কুরূপার ছবি কখনও স্থান পায় না। সুকেশা যদি সুন্দরী হন তবেই শুধু তাঁর ছবি কেশতৈলের ক্যালেণ্ডারে ব্যবহৃত হতে পারে। বিয়ের কনে আর সিনেমার অভিনেত্রী খোঁজবার সময় সুন্দরী মেয়ে খোঁজো, তাতে আমাদের কিছু বলবার

অধিকার নেই ; কিন্তু প্রাইভেট-সেক্রেটারীর চাকরি খালির বিজ্ঞাপনে ফোটোর সহিত আবেদনপত্র দাখিল করতে বলবার অর্থ আমরা বুঝতে পারি না। আর সর্বত্র সৌন্দর্যটা মাপবার চেষ্টা করা হয় আর্যদের চোখ দিয়ে। উত্তর ভারতের আর্য-সংস্কৃতি বাঙ্গালীদের উপর এই অসামঞ্জস্যের বোঝা চাপিয়েছে। কৃষ্ণ চর্মধারী বা স্থূলনাসা ব্যক্তিরা ছিল আর্যদের চক্ষুশূল। কাজেই বাংলার শতকরা নিরানব্বই জন মেয়ের অবস্থা অনুমেয়। পূর্বভারত কবে একদিন আর্যসংস্কৃতি নিয়েছিল ; আজও তার দাম দিচ্ছে এই মেয়েরা। যুগের হাওয়ায় কত কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল ; কত কুসংস্কার ঘুচল ; কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য মাপবার মাপকাঠিটায় একটা আঁচডও পড়ে নি। কৃষ্ণচর্মধারী রাক্ষস ও দস্যুদের প্রতি বিরূপতাটার প্রয়োজন ছিল আর্যদের, নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য, কিন্তু কালোমেয়েদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী কুসংস্কারেব বোঝা আমরা আজও বয়ে চলেছি, সম্পূর্ণ অকারণে। এই অবস্থার একটা আশু প্রতিকার হওয়া দরকার। বিয়ের কনে পছন্দতে আইনের জোর খাটবে না, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানেই সম্ভব কালো বা কুরূপাদের উপর শাসনকর্তাদের একটু পক্ষপাত দেখানো উচিত। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন মেডিকেল কলেজে ভরতি হবার কথা। প্রায় সমান যোগ্যতাসম্পন্না আবেদনকারিণীদের মধ্যে কালো মেয়েদের উপর পক্ষপাত দেখালে ক্ষতি কি ? সুন্দরী মেয়েদের উপর প্রকৃতি পক্ষপাত করেছে , সমাজও করবে ; ভাল বর তার জুটবে সম্ভবত কলেজের পড়া শেষ করবার আগেই। নিজে উপার্জন করেও হয়তো তাকে খেতে হবে না। সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সর্বত্রই উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত কবা যেতে পারে। সাম্যের অর্থ—জীবনে সুযোগ সুবিধার সাম্য। সুন্দরীকে কুরূপার সমান অধিকার দেবার অর্থ, সুন্দরীকে বেশী অধিকার দেওয়া। দেশের গঠনতন্ত্রে অনুন্নত শ্রেণীদের যেমন কতকগুলো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়, সেইরূপ ব্যবস্থা কুরূপা মেয়েদের জন্য কেন করা যাবে না ? এই হচ্ছে পুস্তকখানির মোটামুটি বক্তব্য। এই উদ্দেশ্যে ভারত-সংবিধানের ধারাগুলিতে কোথায় কিরূপভাবে সংশোধন করা উচিত, সে সব অতি নিপুণ নিষ্ঠার সহিত যাজ্ঞবল্ক্য বিবৃত করেছেন। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ। তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি আমাদেরও নৈতিক সমর্থন আছে। সৌন্দর্যই সুন্দরীর সম্পত্তি। ধনীদের সম্পত্তির উপর গভর্নমেন্টের যখন কর আদায় করতে কোন

আপত্তি নাই, তখন সৌন্দর্য-সম্পদের বেলাতেও কোন আপত্তি ওঠা উচিত নয়। চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে সুন্দরীদের স্বাভাবিক সুবিধা একটু হ্রাস করলে, তাদের উপর কোন অবিচার হবে না। বইখানির সবচেয়ে বড গুণ যে আলোচ্য বিষয়ের প্রতি লেখকের আন্তরিক দরদ প্রতি ছত্রে অনুভব করতে পারা যায়। বিধান-সভা ও লোকসভার সদস্যদের দৃষ্টি আমরা এই পুস্তকের দিকে আকর্ষিত করতে চাই। সর্বশেষে লেখককে অভিনন্দন জানিয়ে, আমরা এই বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।"

ছাপা অক্ষরে নিজের লেখার প্রশংসটা পডতে খুব ভাল লাগল স্বরথবাবুর। আবার পড়তে ইচ্ছা করে। এই অজানা সমালোচকের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। ভাল জিনিস বাছবার চোখ আছে এই সমালোচকের। রেখা যদি জানতে পারে যে বাবা অবিবাহিতা কুরূপা মেয়েদের নিয়ে বই লিখেছেন তা হলে বড় লজ্জার কথা হবে। এই ভেবেই ছদ্মনামে তাঁর বই লেখা। লিখেছেন গত দুই বছর ধরে নিজেব চেম্বারে বসে। বাডিতে পাণ্ডুলিপিগুলো পর্যন্ত আনেন নি একদিনের জন্যেও। সব ব্যবস্থা করেছেন বাইরে বাইরে। পুস্তক প্রকাশকদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন কোর্ট ফেরত। তাদের বলা আছে বাড়ির ঠিকানায় যেন ওই সম্পর্কিত কোন চিঠিপত্র না পাঠায়; আর কিছু বলবার থাকলে যেন কোর্টে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কিংবা ফোন করে জানায়। কালো মেয়েদের পক্ষ নিয়ে বাবার জেহাদ্ ঘোষণার কথাটা জানতে পারলে রেখা ভাববে যে তিনি মেয়ের বিয়ে না দিতে পাববার জন্য দুঃখে গুমরে মরেন অষ্টপ্রহব। কথাটা হয়তো ঠিক, কিন্তু তিনি এরকম ধারণা মেয়ের মনে বদ্ধমূল হতে দিতে চান না। রেখা তাঁদের একমাত্র সন্তান, এমনিতেই সে মরমে মরে আছে, তার মনের ব্যথা আর বাড়াতে চান না। তাই ও বিষয়ে তাঁর এত সতর্কতা। মেয়েটার মা যে নেই! মায়ের স্থানও যে নিতে হয় তাঁকেই!

তাঁব বইখানাকে সকলেই ভাল বলছে। কাটতি হয়েছে বেশ। পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে দুই-একখানা চিঠিও আসতে আরম্ভ হয়েছে, অবশ্য প্রকাশকদের ঠিকানায়। একটি মেয়ে চিঠিতে জানিয়েছে যে সুন্দরী আর কুরূপাদের স্বভাবের তারতম্য নিয়েও কিছু বিচার করা উচিত ছিল। সুন্দরী মেয়েরা ছোটবেলা থেকে দেখতে অভ্যস্ত যে তাদের স্থান বাকি সকলের চেয়ে

উঁচুতে। এই শ্রেষ্ঠতাবোধের জন্য পরের জীবনে তারা দশজনের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারে না। নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, সহনশীলতা, নম্রতা প্রভৃতি গুণগুলো কালো মেয়েদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী থাকায়, চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে তারা সমান-বুদ্ধির সুন্দরী মেয়েদের চেয়ে বেশী কাজের হয়। একথা যাঁরা চাকরি দেন তাঁদের মনে রাখা উচিত। পরের সংস্করণে যাজ্ঞবল্ক্য যেন এ বিষয়ে খানিকটা লেখেন ; নইলে তাঁর বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

সত্যিই এই পত্রলেখিকার কাছে সুরথবাবু কৃতজ্ঞ, তাঁর লেখার এই ত্রুটিটুকু ধরিয়ে দেবার জন্য। বইয়ের পরের সংস্করণে তিনি এই ত্রুটি সংশোধন করবার চেষ্টা করবেন।

পিতা-পুত্রী দুজনেই নীরবে কাগজ পড়ছেন। সুরথবাবু আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। কাগজের পাশ দিয়ে রেখাও ঠিক সেই মুহূর্তে বাবার দিকে তাকিয়েছিল। দুই জনের চোখেই একই ধরনের অস্থিরতা। দুই জনেই যেন ধরা পড়ে গিয়েছেন। কাশি এল সুরথবাবুর। একটু অপ্রস্তুত হয়ে দুই জনেই অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে আবার কাগজ পড়া আরম্ভ করলেন। খড় খড় করে পাতা ওলটাবার শব্দ হল দুই জনের কাগজেই। দুই জনের মুখই কাগজের আড়ালে লুকানো। চেয়ারের একেবারে কিনারায় বসেছে, একথা রেখার খেয়াল নেই। সুরথবাবুর পা দুলছে টেবিলের নীচে। দুই জনেই এখন এক বার এঘর থেকে চলে যেতে চান ; অথচ হঠাৎ চলে যাওয়াটা একটু অস্বাভাবিক দেখায়। আড়ষ্টতা দূর করে সহজ ভাব ফিরিয়ে আনবার জন্য সুরথবাবু এতক্ষণে কাগজের আধুনিকতম আন্তর্জাতিক খবর সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করলেন—"কেবল হুমকি।"

মেয়ে সায় দিল, "হ্যাঁ।"

"এ কী। তোর চায়ে মাছি পড়লো যে! এখনও চা খাসনি!"

রেখা চা একটু ঠাণ্ডা করেই খায় চিরকাল। বলল, "কী জ্বালাতন যে করে মাছিগুলো!"

আর একবার চায়ের জল চড়াবার অজুহাত পেয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এখান থেকে ওঠবার সুযোগই সে খুঁজছিল এতক্ষণ থেকে। বাবা, তার আসল অবস্থাটা অনুমান করতে পারেন নি। 'দৈনন্দিন' কাগজখানা মেয়েকে হাতে করে নিয়ে যেতে দেখে সুরথবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। অর্থাৎ নিজের হাতের

ইংরাজী কাগজখানা এখনই মেয়েকে দিয়ে দিতে হবে, এইটাই ছিল তাঁর ভয়। কালো মেয়েদের সম্বন্ধে লেখা ওই পুস্তক সমালোচনাটা উনি চান না যে মেয়ে পড়ে। বড় আদরের মেয়ে তাঁদের। কোন স্ত্রীলোকের চেহারা বা কোন মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই রেখার মুখ কাঁচুমাচু হয়ে যায়, এ জিনিস তিনি বহুবার লক্ষ্য করেছেন। বক্তা হয়তো কিছু ভেবে বলেন নি, কিন্তু তবু সে সঙ্কুচিত না হয়ে পারে না। চোখ দুটোও যেন একটু ছলছল করে। তাকানো আর যায় না সে মুখের দিকে তখন! সেইজন্য স্থরথবাবুর এত সতর্কতা। বাইরের লোকে তো এত বোঝে না। কে আর কার জন্য ভাবতে যাচ্ছে এ সংসারে! ঠেস দিয়ে কথা বলাই লোকের অভ্যাস। তাই তিনি দয়ামায়াহীন সংসারের রূঢ়তার হাত থেকে সব সময় মেয়েটিকে আড়াল করে করে রাখেন। কিন্তু তিনি আর কতকাল বাঁচবেন; মেয়েটার সারাজীবন যে এখনও সম্মুখে পড়ে! এত বড পৃথিবীতে মেয়েটা যে একেবারে একা পড়ে যাবে! সব চেয়ে দুঃখের কথা, মানসিক গঠনের দিক দিয়ে রেখার ঝোঁক গৃহস্থালির দিকে! কী গুছিয়ে যে সংসার করে!

ছেলেপিলে-ভরা বাড-বাডন্ত সংসারের গৃহিণী হিসাবেই তাকে মানায়। কিন্তু মেয়েটিকে পাত্রস্থ করতে পারেন নি তিনি আজও। কানা নয়, খোঁড়া নয়, বুদ্ধিমতী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। টাকা পয়সা খরচ করতেও তিনি রাজী। তা ছাড়া তাঁর যা কিছু থাকবে সব তো ওই মেয়েই পাবে। এ সব সত্ত্বেও কোন পছন্দসই পাত্র তাকে বিয়ে করতে রাজী হয় নি। স্থন্দরী মেয়ে চায় সকলেই। কালো মেয়েরা তাহলে যায় কোথায়! কত সম্বন্ধ তো এল; কেউ পছন্দ করে না! এই সম্পর্কে তাঁর অন্তরে একটা একান্ত গোপন ব্যথা আছে। ব্যথা নয়, অনুশোচনা। কত দেশে কত মেয়ে সারাজীবন অবিবাহিতা থাকে, কত অবিবাহিতা স্ত্রীলোক কত মহৎ কাজ করে গিয়েছে জীবনে; এ সবের নজীর তাঁর কণ্ঠস্থ। তবু একটা দোষীভাব অষ্টপ্রহর তাঁকে পীড়া দেয়। মেয়েকে পাত্রস্থ না করতে পারবার জন্য দায়ী করেন তিনি নিজেকে। সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা, রেখার মা তখন বেঁচে। এক জায়গায় মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়েছিল। তারাই একমাত্র পাত্রপক্ষ যারা রেখাকে দেখে পছন্দ করেছিল। উচ্চ বংশ। অবস্থা খারাপ। ছেলেটি বেশ ভাল পড়াশোনায়। মা-বাপের নজর কিন্তু ছিল বড় ছোট।

টাকাকড়ি দানসামগ্রী বেশ নেবে। যা বলেছে তাতেই রাজী তিনি। জানছে যে রেখা মা-বাপের একমাত্র কন্যা—বাপের সব সম্পত্তিই পাবে, তবু খাঁই মেটে না কিছুতেই। কথাবার্তা পাকাপাকি হবার পরও দু বার মোচড় দিয়ে দিয়ে যৌতুক আর দানসামগ্রীর পরিমাণ বাড়াল। তাদের প্রাপ্য প্রণামীর তালিকা প্রত্যহ পরিবর্ধিত হতে আরম্ভ হল। তবু তিনি না বলেন নি কিছুতে। কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল বিয়ের আগের দিন। বরের ছোট ভাই সেদিন এসে বলে যে একটা রেডিওর কথা বলতে ভুল হয়ে গিয়েছে। রেডিওটার নাম, ধাম, দাম সব সে কাগজে লিখে এনেছে। শুনেই রাগে জ্বলে উঠেছিল সর্বশরীর স্থরথ-বাবুর। আত্মাভিমানেও আঘাত লেগেছিল। বরপক্ষের লোকেরা ভাবে কী! তাঁর চেয়েও বেশী চটেছিলেন রেখার মা। তিনি বরের ভাইয়ের সম্মুখে বেরিয়ে এসে বললেন—"আমার পাঁচটা নয় দশটা নয় ওই একটি মাত্র মেয়ে। তার বিয়ে আমি অমন বাড়িতে দেব না। ও ওখানে স্থখী হতে পারবে না কোনদিন।" বরের ভাই মুখ কাঁচুমাচু করে চলে গিয়েছিল। তার পর বরের বাবা এসেছিল, তাঁদের রেডিওর চাহিদা প্রত্যাহার করে, সামান্য ভুল বোঝাবুঝিটা মিটিয়ে ফেলবার জন্য। কিন্তু স্থরথবাবু আর তাঁর স্ত্রী মত বদলান নি। পরিষ্কার বলে-ছিলেন—অত ছোট যাদের মন তাদের ঘরে মেয়ে দেবেন না কিছুতেই। এর জন্য তাঁদের মেয়েকে যদি আজীবন অবিবাহিতা থাকতে হয়, তাও স্বীকার।

রেখার মায়ের স্বর আরও চড়া। "আমাদের মেয়ে ফেলনা নয়। বর তার জুটেই যাবে। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব!"

সে বিয়ে ভেঙ্গে গেল, কিন্তু রেখার বর আর জুটল না। তারপর রেখার মা তো স্বর্গে চলে গেলেন সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে। দায়িত্বের বোঝা এসে চাপল একা স্থরথবাবুর উপর। সেই থেকে একটা দোষী-দোষী ভাব সব সময় তাঁর মনের মধ্যে কিরকির করে বেঁধে। ওই ছেলের সঙ্গে রেখার বিয়ে না দেবার দায়িত্বের অর্ধেকটা স্বর্গগতা স্ত্রীর উপর চাপিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতেও দোষের বোঝা হাল্কা হয় না। বাড়ির লোকের স্বভাব যেমনই হ'ক, ছেলে নিজে তো কোন দোষ করে নি। সে পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হলে হয়তো রেখা স্থখী হত। ছেলেটি জীবনে বেশ উন্নতি করেছে। রেখা না জানতে পারে, কিন্তু তিনি সে খবর রাখেন। এই তো পরশু তিনি এক

বন্ধুকে প্লেনে উঠিয়ে দেবার জন্য এরোড্রোমে গিয়েছিলেন। সেদিন সে ছেলেটিও সপরিবারে আমেরিকা যাচ্ছে। ছেলে আর নয়, এখন সে বেশ বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তার সেই ছোট ভাইটি, এবং আরও অনেক আত্মীয়স্বজন, তাদের প্লেনে তুলে দিতে এসেছে। হঠাৎ দেখা। স্বরথবাবু দেখেছিলেন তাদের ; ছেলে আর তার ভাইও দেখেছিল তাঁকে। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন ; তারাও না দেখবার ভান করেছিল। কিন্তু তাদের কথাগুলো তো সব কানে আসছিল। স্ত্রীটির রঙ বেশ কালো; রেখার চেয়ে বেশী বই কম হবে না। দেওর তাকে ডাকল কালো-বউদি বলে। হেসে কালো-বউদি কি যেন একটা জবাব দিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, দেওর পথে পড়বার জন্য তাঁর লেখা বইখানি দিয়ে বলেছিল—"কালো-বউদি, এই বইটা খানাপিনার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে পড়ে ফেলো। কাজে দেবে। শিকাগোর হোটেল থেকে নিগ্রো বলে আবার তোমাকে ভাগিয়ে না দেয়!"

শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল মেয়েটি। "না ভাই ঠাকুরপো, অত প্রশংসা করে বাড়িয়ে বলছ কেন? সেরকম কোঁকড়া চুল আমি পাব কোথায়! আচ্ছা, হোটেল থেকে তাড়িয়ে দিলে কালো মেয়েদের কি করতে হয়, সে কথাও এই যাজ্ঞবল্ক্যের বইখানায় লেখা আছে নাকি?"

আবার সেই খিলখিল করে হাসি।

তার স্বামী বলে—"না না, শিকাগোর ওদিকে ওসব সাদাকালোর বাছ-বিচার নেই।" এই অব্যক্ত বেদনায় স্বরথবাবুর মন ভারি হয়ে উঠেছিল সেদিন এরোড্রোমে। নিজেদের জিদ ও স্পর্শাতুরতা রেখার ভবিষ্যৎ ভেবে একটু কমালেই হত! মেয়ের ভাল-মন্দের চেয়ে, নিজেদের মিথ্যা আত্মসম্মান-জ্ঞানকে বড় করে দেখেছিলেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী একদিন। তাই এই অনুশোচনা। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি পরশু এরোড্রোম থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। রেখা জিজ্ঞাসা করেছিল—"মুখখানা অমন দেখাচ্ছে কেন বাবা তোমার? শরীর খারাপ হয় নি তো?"

স্বরথবাবু বলেছিলেন—"না। রৌদ্রে দাঁড়িয়েছিলাম কিনা এতক্ষণ। জল দে তো এক গ্লাস।" এ হল পরশুদিনের কথা।

আজ, এখন রেখাকে নূতন করে চায়ের জল চড়াতে যেতে দেখে তিনিও

উঠলেন চেয়ার থেকে। নিজের ঘরে ঢুকে ভাবলেন, ইংরাজী কাগজের পুস্তক সমালোচনার পাতার সেই জায়গাটুকু কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে দেবেন। পরে রেখা কাগজ পড়বার সময় ভাববে বাবা নিশ্চয়ই কোন দরকারী বইয়ের 'রিভিউ' কেটে রেখে দিয়েছেন। এর চেয়ে বেশী মাথা ঘামাবে না সে নিশ্চয়ই এ নিয়ে। কিন্তু যদি ঘামায় ? যদি জিজ্ঞাসা করে বইখানার নাম কি ? মেয়ের কৌতূহল চিরকালই খুব বেশী। তার চেয়ে ভাল ওই পাতাখানাকেই সরিয়ে ফেলা। পড়বার সময় রেখা যদি জিজ্ঞাসা করে ওই পাতাটার কথা, তখন না হয় বললেই হবে যে আজ ভুল করে ও পাতাটা দেয় নি কাগজে। কথাচ্ছলে আগে থেকেই জানিয়ে রাখলে কেমন হয় মেয়ের কাছে ? না, দরকার কি নিজে থেকে ও-কথা তোলবার ! পুস্তক সমালোচনার পাতাটা তিনি আলনায় টাঙানো জামার পকেটে রাখলেন। ট্রেনে ভালভাবে পড়বেন বারকয়েক নিজের বইয়ের সমালোচনাটা, এই তাঁর ইচ্ছা। আর মনে মনে ঠিক করে রেখে দিলেন যে বাংলা কাগজটা আজ আর তিনি নিজে থেকে চাইবেন না রেখার কাছে। মেয়ে যদি স্টেশন যাবার সময় পর্যন্ত ইংরাজী কাগজটা তাঁর কাছ থেকে না নেয়, তা হলে একটু অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে সেখানা নিয়েই তিনি গাড়িতে উঠবেন।

রেখা ওদিকে উনুনে চায়ের জল চাপিয়েই ছুটেছে নিজের ঘরে। নিজের কাগজ থেকে সেও একটা ফোটো-সম্বলিত সংবাদ কেটে বাদ দিয়ে দিতে চায়, কাগজখানা বাবার হাতে পড়বার আগে। এগুলো লোকেরা নিজের খরচেই ছাপায় নাকি ? না এরোপ্লেন কোম্পানির লোকরা ছাপিয়ে দিয়েছে ? আমেরিকার কোন কোম্পানিতে এক জন বাঙ্গালী চাকরি পেয়েছে, সেটাও কি একটা সংবাদপত্রে ছাপবার মত খবর ? রেখা আবার পড়ল ফোটোগ্রাফের নীচের লাইনগুলো। এখানকার কৃতী ধাতুতত্ত্ববিৎ শ্রীরমেশচন্দ্র রায় শিকাগো শহরের বিখ্যাত গবেষণাগারে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়ে অমুক এয়ার লাইনে আমেরিকা যাত্রা করেছেন। মানুষটির বুক পর্যন্ত ফোটো। এয়ার লাইনের যখন উল্লেখ করেছে তখন এরোপ্লেনে ওঠবার সময়ের ছবি দেওয়াই উচিত ছিল। জন্মের স্থান, বৎসর, পিতার নাম, এবং কোন্ ল্যাবরেটরিতে কোন্ বিষয়ে গবেষণা করেছেন তার তালিকা ফোটোগ্রাফের নীচে দেওয়া আছে। সব

সংবাদ দেওয়া আছে; শুধু যে খবরটার জন্য রেখার কৌতুহল সেইটাই নেই। কৃতী ব্যক্তিটির স্ত্রী বা সন্তানাদির কথা কিছু লেখা নেই। তবে কি ভদ্রলোক এখনও অবিবাহিত? না না, এত বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে যাবেন কেন ভদ্রলোক! অমন একজন পাত্রকে মেয়ের বাপরা ছাড়বে কেন? হতে পারে যে উনি বিপত্নীক। কিংবা হয়তো মেম বিয়ে করেছেন। কোন কারণ নেই এত কথা ভাববার; রেখা তবু না ভেবে পারে না। ফোটোটা আবার দেখল ভাল করে। নাক মুখ চোখ ভাল; মাথার দু পাশে টাক পড়তে আরম্ভ হয়েছে। সে যদি আজ আমেরিকায় থাকত, বাবার তা হলে এখানে বড় অসুবিধা হত। চাকরবাকরে কি আর সেরকম করে দেখা-শোনা করতে পারে বুড়োমানুষের। বাবা তাকে ছেড়ে কি থাকতে পারতেন!...

রেখা চায় না যে এই ফোটোগ্রাফ ও খবরটা বাবার চোখে পড়ুক। বাবার মনের গভীর ব্যথার কথা সে জানে। এই খবরটা পড়লে তাঁর মনের অপরাধী ভাবটা আর এক দফা নূতন করে জাঁকিয়ে বসবার সুযোগ পাবে। বাবার দুশ্চিন্তার বোঝা সে আর বাড়তে দিতে চায় না। তিনি যতই তার কাছে লুকোতে চেষ্টা করুন, যাজ্ঞবল্ক্য নামের লেখকটি কে, সেকথা সে জানে। সে বইখানাও রেখা পড়েছে। বাবাকে জানায় নি শুধু তিনি অপ্রস্তুত হবেন ভেবে। ন্যায়-প্রকাশনীর লোকদের কাছ থেকেই সে খবরটা জেনেছিল। বইখানা পড়ে সে বেনামীতে যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে খানকয়েক চিঠিও দিয়েছে। চিঠিতে জানিয়েছে যে লেখক কালো মেয়েদের যতটা অসহায় ভাবেন, তারা ততটা অসহায় নয়, সুন্দরীদের চেয়ে তাদের কর্মপটুতা সাধারণত বেশী। সব চিঠিগুলোর মধ্যে দিয়েই সে বাবাকে জানাতে চেয়েছে যে অবিবাহিতা স্ত্রী-লোকদের জন্য কোন রকম দুশ্চিন্তা করবার দরকার নেই, আজকালকার দুনিয়ায়; বিশেষ করে যাদের অর্থাভাব নেই তাদের জন্য।

ফোটোগ্রাফ ও সংবাদটা কাটতে গিয়ে হঠাৎ সে সতর্ক হয়ে গেল। বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন—"কি কেটে রাখলি? ওবেলা কাগজখানা পড়া হয়ে যাবার পরই কাটতিস না হয়।" তা হলে সে কী জবাব দেবে? বলতে তো পারে সে কত কিছু—বনস্পতি কোম্পানির পাকপ্রণালী, বোনবার পশমের ক্যাটালগ,

টুথপেস্টের নমুনা, কিংবা সাবান কোম্পানির প্রতিযোগিতার আবেদনপত্র। কিন্তু যদি বাবা ধরে ফেলেন, যে কাগজের ঠিক ওই জায়গাটাতে ওসব বিজ্ঞাপন দেয় না! তার চেয়ে ও পাতাটা সরিয়ে ফেলাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। বাবা খোঁজ করলে বলবে—ঝি-চাকরে কোথায় যেন ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝি-চাকরদের উপর একটু বকাবকি করে দিলেই কাজ হবে। পাশের ছোট ঘরটায় পুরনো কাগজ স্তূপাকার করে রাখা আছে। তারই সবচেয়ে নীচে সে রেখে দিল আজকের বাংলা কাগজের সেই ফোটোগ্রাফের পাতাখানা। আজকের কাগজের বাকি পৃষ্ঠাগুলো সে ভাঁজ করে সযত্নে তুলে রাখল নিজের ঘরের টেবিলের উপর। বাবা না চাইলে আজ আর সে নিজে থেকে বাংলা কাগজখানা তাঁকে দিয়ে আসবে না। তারপর রেখা গেল চায়ের জল ফুটল কিনা দেখতে।

রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘরের কাজকর্ম দেখবার অজুহাতে সে তারপর বাবার সম্মুখে আর গেল না কিছুক্ষণ। পৌনে নটার সময় দেখল, বাবা ঢুকলেন বাথরুমে। এতক্ষণে সে আশ্বস্ত হল, বাংলা কাগজখানা তিনি আর তা হলে এখন চাইবেন না। ওবেলা ফিরে এসে চাইলে, একখানা পাতা হারিয়ে যাওয়ার কথাটা সেরকম অস্বাভাবিক ঠেকবে না তখন।

"দিদিমণি!"

ধোপা এসে কাপড়ের বস্তা ফেলল ধপ করে। বাথরুম থেকে বাবার কাশি শোনা গেল।

সুরথবাবু বেশ বিচলিত হয়েছেন। অনবরত গলা বেয়ে কাশি ঠেলে আসছে তাঁর। স্নান যত শীঘ্র সম্ভব সেরে তিনি বেরিয়ে এলেন। যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই!

রেখা তার আগেই ইংরাজী কাগজের পুস্তক সমালোচনার পাতাটা তাঁর পকেট থেকে বার করে ফেলেছে, জামা ধোপারবাড়ি দেবার জন্য। যা ভয় করা যায় ঠিক কি তাই হবে! মেয়ে নিশ্চয়ই পাতাটা খুলে দেখে থাকবে! সে ও ঘরে ধোপার খাতা লিখছে এখন! কাগজখানা রাখল কোথায়? কিন্তু একথা তার কাছে জিজ্ঞাসা করতে বাধে। ওই কাগজখানা পকেটে রাখবার একটা কারণ খুঁজে বার করতেই হয়!

হঠাৎ মনে পড়ল। মেয়ের কাছে বলবার মত একটা কারণ খুঁজে পেয়ে

অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচলেন সুরথবাবু। যে ছোট ঘরে পুরনো কাগজ জড় করা থাকে, সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। একখানা পুরনো কাগজের তাঁর দরকার; ষ্টেশনে যাবার সময় পকেটে করে নিয়ে যাবেন। কাগজের স্তূপের সবচেয়ে তলা থেকে সবচেয়ে পুরনো অর্থাৎ অদরকারী কাগজখানাকে তিনি টেনে বার করলেন।

রেখা ছুটে এসেছে ওঘর থেকে। "বাবা, কি করছ এখানে? কিছু খুঁজছ নাকি?"

"একখানা পুরনো কাগজ নিলাম। যা ছারপোকা রেলের বেঞ্চিগুলোয়! পেতে বসা যাবে।"

॥ জলভ্রমি ॥

এদেশে কথায় বলে—"গেরস্তকে জেরবার করতে হলে তাকে একটা হাতী কিনে দাও, আর দুষ্টু রায়তকে জেরবার করতে হলে পাশের জমিটা 'বাধিয়া'কে দাও।" বাধিয়া হচ্ছে শীর্ষাবাদিয়া শব্দের অপভ্রংশ।

শেষ জীবনে তাই পীরগঞ্জ কুঠির বুড়ী মেম স্থানীয় প্রজাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে হাসান্নু শীর্ষাবাদিয়াকে আনিয়েছিলেন এখানে, গঙ্গার বুকেব ভঁইসদিয়ারা চর থেকে। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছব আগেকার কথা।

শোনা যায় শীর্ষাবাদিয়ারা নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর হাবসী সৈন্যদেব বংশধর। এতকাল লাঙল ধবে, আব পান্তভাত খেয়েও, এদের রক্তের গরম আজও কাটলনা। কথায় কথায় হেঁসোদা দিয়ে লোকেব গলা কাটতে চায়। গঙ্গার বুকে নতুন চডা পডলেই এরা হানা দেয়।···

এতকাল থেকে এখানে বসবাস কবছে—আজ সে বুডো অথর্ব—কিন্তু একদিনের জন্যও হাসান্নু পীবগঞ্জ জায়গাটাকে ভালবাসতে পারল না। থাকতে হয়, তাই আছে। বিবির সঙ্গে মেজাজের মিল না হলেই কি, মিয়া তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে? রুজিরোজগার, ছেলেপিলে, সুবিধা-অসুবিধা, আরও কত কিছুর কথা ভেবে চলতে হয় এই দুনিয়াতে। জায়গার বেলাতেও তাই।

হাসান্নু শীর্ষাবাদিয়া আর পীরগঞ্জের সেওরা নদী, তেল আর জল।

···গঙ্গাও নদী, আবার সেওরাও নদী। রাঘববোয়ালও মাছ, আবার চুনোপুঁটিও মাছ। নামে নদী, আসলে নালা। কচুবি-পানার খেত। হেঁটে পার হওয়া যায় বছরে দশ মাস। এপারের রাখাল গুরু চরাতে চরাতে ওপারের রাখালের সঙ্গে হাসিগল্প করে সারাদুপুর। ওই সবই পারে এখানকার লোকে। কেবল গল্প আর খয়নিডলা, কাজ করে কতটুকু। আর ভালবাসে মেয়েদের আঁচল ধরে ফষ্টিনষ্টি করতে। লাঠির জোরও

নাই, মনের জোরও নাই, গায়ের জোর তো নাই-ই। হাসান্নুমা আসবার আগে এখানকার লোকের এতটুকু মুরদ ছিল না যে ঘাট থেকে কচুরিপানা তুলে ফেলে, হেঁটে নদী পার হবার পথটুকু পরিষ্কার করে নেয়। সেইসব কথাই হাসান্নু বসে বসে ভাবে।

সেওরা নামটা সে কখনও মুখে আনে না; বলে নালা।

এখন ভাদর মাসে নালাটা অন্যবারের চেয়ে একটু বেশী ভরে উঠেছে; তাইতেই এখানকার লোকের কি তড়পানি! ভরা দুপুরেও ব্যাঙ ডাকছে নালার ধারে। এই নালার ধারের লোকের কলেজা আর কতটুকু হবে! বড় জল আর ছোট জল। বড় জলের লোকেরা সামনাসামনি লড়াই করে; ছোটজলের ছিঁচকেরা চিমটি কাটে পিছন থেকে। এরা বানের জলে ঘরদুয়ার ডুবতে দেখেনি, বর্ষার তোড়ে নদীর পাড় ভাঙ্গতে দেখেনি, নতুন চর দখল করেনি লাঠির জোরে কোনদিন। বুকের পাটা আসবে কোথা থেকে এদের! ছোট নদীরা বাঁজা, তাই তাদের বুকে চর জাগে না, আর পাড়ে মরদ জন্মায় না।

জলের কথা বাদই দাও। এরা হল ডাঙ্গার মানুষ; কিন্তু বালিই কি এরা কোনদিন দেখেছে? জলের ঢেউ-এর তবু এরা নাম শুনেছে, কিন্তু বালির ঢেউয়ের কথা শুনলে হাসে। গরমের সময় একসার বালির ঢেউ কেমন করে আর একসার বালির ঢেউকে তাড়া করে তা কি এরা জানে? শুকনো বালির উপর চরের হাওয়ার সিরসিরুনি আঁকাজোকার খেলা দেখেছে? সে শীতের কুয়াশা সে বালির ঝড়ের গরম, সে কাদা-পাঁকের নরম, সে হাওয়া, সে বিদ্যুৎ, সে মেঘের খেলা কোথায় পাবে এখানে? ছাই! বড় নৌকাই দেখেনি এরা জীবনে। এখানকার আমকাঁঠালের বাগান আর বট অশত্থ গাছ লোককে ডাকে গাছতলায় বসে সারাদিন গল্প করবার জন্য। চরে আছে শুধু মানুষের পোঁতা কলাগাছ, আর বুনো ঝাউগাছ; তারা বুকেরপাটাওয়ালা। মানুষদের ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম করে দিনরাত। এখানকার মানুষে কুড়ের বাদশা হবে না তো হবে কি!

সেই হাসান্নু শীর্ষাবাদিয়ার আজ এই হাল! ঘরের মধ্যে বসে জুম্মার নমাজ সারতে হল! এ কি কম দুঃখের কথা! তাকে এখানে ধরে রাখবার

জন্যই পঞ্চাশ বছর আগে বুড়ী মেম নীলের-চৌবাচ্চা-ভাঙ্গা ইঁট দিয়ে একটা মসজিদ তয়ের করিয়ে দিয়েছিল। চরে-না থেকে ডাঙ্গায় থাকার এইটুকুনই ছিল লাভ। তাও নাই কপালে! বুড়ো হয়েও বাঁচতে হলে, তার দাম দিতে হয় কড়িগুণে।

"ওরে মুন্না! কদুর তেলের শিশিটা এনে দেতো!"

এই ভাদ্দুরে রোদে নাতিটা নালার ধারে কলকে ফুলের বিচি দিয়ে হারজিত খেলা খেলছে আর দুটো ছেলের সঙ্গে।

"নিজে পেড়ে নাও না। আমি এখন যেতে পারব না।"

প্রায় চারকুড়ি বছর বয়স হ'ল; তার মুখের উপর বেয়াদবি করে রেহাই পেয়েছে কেউ কোনদিন, এমন লোকের কথা মনে পড়ে না। হাতী পাঁকে পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে। নাতি না ছাই! রক্ত ফিকে হয়ে গিয়েছে ওদের। ওর মা যে এখানকার মেয়ে। তখনই পইপই করে বারণ করেছিলাম ছেলেকে। রহিম কিছুতেই শুনল না। তার মাকে দিয়ে বলাল যে সে এখানকার মেয়েই সাদি করবে। কর বাবা যা ইচ্ছা। ওর মা তো চলে গেল যেখানে যাবার; এখন ভোগান্তি যে বুড়ো বেঁচে থাকল, তার।

মুশকিল হচ্ছে যে তার সময়ের শীর্ষাবাদিয়াদের মত তাদের ছেলেরা এখানকার লোকদের পর বলে ভাবে না। জাতবেরাদার হলেই হল। ওদের আর দোষ দিয়ে কি হবে; সে নিজেই নিজের দেশের ভাষা প্রায় ভুলে গিয়েছে আজকাল।

কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে। তবু আজ এমন পচা গরম। যত বেলা বাড়ে তত মাথার যন্ত্রণাটা বাড়ে। চোখের ভিতরের টনটনানিটাও বাড়ে। খোলা হাওয়ায় বসতে পারলে মাথার যন্ত্রণাটা কমত। কিন্তু সে জো কি আছে! বুড়ো হবার নানান লেঠা। দিন আর রাত প্রায় এক হয়ে এসেছে। তবু রাত্রিতেই সুবিধা। আলো সহ্য হয় না। রোদের দিকে তাকালে চোখ দিয়ে জল পড়ে।

ইচ্ছা করে নাতিটার সঙ্গে জন্মের মত কথা বন্ধ করে দিতে; কিন্তু স্বার্থে বাধে। ওটা মাঝে মাঝে কুঠির জঙ্গল থেকে ময়নাফল, বকুলফল, আঁশফল, এইসব দু'চারটে এনে দেয়।

হাত বুলিয়ে হাসান্থু নিজের মাথার গরমটা আঙুলের ডগায় একবার পরখ করে নিল। মাথার মধ্যেখানটা চৌকোণা করে কামানো। সেই জায়গাটা দিয়ে আগুন বার হচ্ছে। সেইখানটাতে ভাল করে কদুর-বিচির-তেল বসাতে বলেছে হাকিম। তেলটা এত ঠাণ্ডা যে লাগান মাত্র নাক দিয়ে জল গড়ায়। বুড়ো বেশী মেখে ফেলবে ভয়ে রহিমের বউ শিশিটিকে ওঘরে রেখে দেয়। হাসান্থু উঠল শিশিটাকে আনবার জন্য। মাথা গরম হলেই তার মাথা ঘোরে। তাই লাঠিটা নিল হাতে। মাথা যখন ঘোরে তখন উঁচু নীচু জায়গায় চলাফেরা করতে অসুবিধাটা হয় বেশী। হাঁটুর কাছটাতেও জোর পায় না, অনেকদিন থেকেই। মেঝে, চৌকাঠ, সিঁড়ি যা দেখ সব তিরতির করে কাঁপছে।

ওঘর থেকে কদুর তেলের শিশিটা আনবার সময় ঘরের চারিদিকে ভাল করে দেখে নিল কোথাও কিছু খাবার জিনিস আছে কিনা। না। ছেলের বউ খাবার জিনিস সব লুকিয়ে লুকিয়ে রাখে। বারান্দায় ওটা কী যেন হলদে হলদে? আলোতে তাকান যাচ্ছে না। কাক ডাকছে কেন বারান্দায়? চোখ আধবোজা করে একটু আগিয়ে যেতেই চৌকাঠে হোঁচট খেল। বড় মাছিগুলো উড়ল ভোঁ করে। খুব বেঁচে গিয়েছে তেলের শিশিটা! কেউ নাই তো? এদিকে তাকিয়ে নাই তো সেই শুকুনচোখো মাগীটা? যা ভয় করেছিল ঠিক তাই।

তালের আঁটিটা তুলে নিতেই নদীর পাড থেকে হাঁ হাঁ করে উঠেছে রহিমের বউ। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছে বুড়ো। টপ করে তালের আঁটিটা ফেলে দিয়ে লুঙ্গিতে হাত মুছে নিল।

"না না আমি শুধু দেখছিলাম জিনিসটা কি। আমি এসেছিলাম তেলের শিশি নিতে।"

কেউ তার কাছ থেকে জবাবদিহি চায়নি; কেউ শুনছে না; শুনলেও কেউ বিশ্বাস করবে না; তবু সে বারবার বলবে ওই কথা।

হাসান্থু আবার এসে বসল চাঁদিতে কদুর তেল লাগাতে।

"নৌকা আসছে! নৌকা! হাঁড়ির নৌকো!" মুন্নার দল ছুটে গেল ঘাটের দিকে। বর্ষার সময় সেওরায় জল বাড়লে গঙ্গার ধারের মনিহারী থেকে মাটির

হাঁড়ি বোঝাই নৌকা দুই-একখানা আসে এদিকে প্রতি বছর। মাঝারি সাইজের নৌকাও এখানে একটি দ্রষ্টব্য জিনিস। তাই হাঁড়ি কিনবার দরকার না থাকলেও ভেঙ্গে পড়ে গ্রামের ছেলেবুড়ো সকলে হাঁড়ির-নৌকা দেখবার জন্য। হাসানু ঘরের মধ্যে থেকে বুঝতে পারছে যে গ্রামসুদ্ধ সবাই ছুটছে ঘাটের দিকে। তার নিজেরও ইচ্ছা করছে নৌকার হাঁড়িওয়ালার সঙ্গে একবার দেখা করতে।...লোকটা কি আর ভঁইসদিয়ারার চর হয়ে আসেনি। অনেক খবর জানবার ছিল লোকটার কাছ থেকে। কিন্তু যাবার সামর্থ্য যে নাই।......গঙ্গার বুকের এঁটেল মাটি না হলে কি ভাল হাঁড়ি হয়! পাবে কোথায় সে মাটি এখানকার লোকে। ঠকিয়ে খুব বেশী দাম নিয়ে যায় হাঁড়িওয়ালা এখানকার বেকুব লোকগুলোর কাছ থেকে, তবে বেশ হয়। শুধু কি বেকুব! ছোট নজর এদের। না খাইয়েই মারতে চায় তাকে রহিমের বউ। তালের আঁঠিটা নিয়ে কী ছোটই না হতে হল খানিক আগে! তালের আঁঠি কি ফেলে দেবার জিনিস? ছেলের বউ যখন হাঁ হাঁ করে উঠেছিল তখন যদি সে বলত যে কাকের হাত থেকে তালের আঁঠিটাকে বাঁচিয়ে তুলে রাখবার জন্য সে ওটাকে নিয়েছিল, তাহলেই ঠিক হত। কিন্তু ঠিক সময়ে কথাটা মুখে যোগাল কই? ওই রকমই হয় আজকাল। যে কথাটা মনে আসা উচিত, ঠিক সেইটাকে ছাড়া বাকি সব কথা মনে আসে।...কডুর তেলের গন্ধতেও হাতেলাগা তালের গন্ধটা ঢাকা পাড়েনি।

ঠাণ্ডা তেলটা মাখতে মাখতে ঝিমুনি আসে। ঢুলুনি ভাঙ্গবার মুহূর্তে নিজের নাকের ডাক নিজের কানে শুনতে পেল হাসানু। তেল জবজবে হাতটা এখনও তার মাথায়।

......দূরে ওই রহিমের বউয়ের গলা না? নালার ধারের বটতলার দিকে? কার সঙ্গে কথা বলছে? চেনা গলা। বাকর না? বাকরটাকে সে কোনদিন দুচক্ষে দেখতে পারে না। বড় ফক্কড়! ওর বাপটাও ছিল ওরই মতন। ওই শুনতেই জ্ঞাতবেরাদার! না আছে কথা বলবার ঢঙ, না আছে কথার ঠিক-ঠিকানা। বিশ্বাস করতে পারা যায় না ওদের। পাটের শাক দিয়ে ভাত খাবার সময় কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে—'হ্যাঁরে ওটা পাটের শাক নাকি রে'—অমনি হাত দিয়ে ঢেকে নেবে শাকটাকে—যেন কি দিয়ে

ভাত খাচ্ছে বললে আমি সেটাকে খেয়ে নেব। স্বভাব! যদি বলে পূবে যাচ্ছি, তবে যাবে পশ্চিমে।

নালার এপারে একজন, ওপারে একজন।

"তুই হাঁড়ি কিনতে গেলি না যে?"

"মুন্নার বাপই আছে সেখানে হাঁড়ি কেনবার জন্য।"

"দু হাতে দুটো হাঁড়ি নিয়ে আসবার সময় যদি রহিমের গায়ের দাদ চুলকে ওঠে, তাহলে কি হবে?"

"হবে আবার কি। বাকরের মত দোস্ত যখন সঙ্গে নেই, তখন অন্য কেউ চুলকে দেবে।"

"বর্ষায় মোষে-দাদ দগদগে হয়ে উঠেছে। কখন যে সুড়সুড় করে উঠবে বলা যায় না।"

দুজনে হাসছে। রহিমের বউ হাসছে খিকখিক করে। নালার ওপার থেকে বাকর হাসছে হো হো করে। এত বেহায়া! বুড়ো শ্বশুর যে শুনতে পাচ্ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই! রহিমের সর্বাঙ্গে দাদ; সেইজন্য বউ এক চাটাইতে ওর সঙ্গে শোয় না। একথা তার জানা; কিন্তু তাই বলে স্বামীকে নিয়ে ঠাট্টা করবে বাইরের লোকের সঙ্গে? যতই হক না কেন বাকর, বউয়ের ছেলেবেলার বন্ধু!

"তা তুই নৌকো দেখতে গেলি না কেনরে বাকর?"

"তুইও যে জন্য যাসনি আমিও সেইজন্য যাইনি।" আবার হাসছে দুটোতে মিলে! জানে যে বুড়ো শুনতে পাবে, তাই বোধহয় সাটে কথা বলছে। ওকথার আর কোন মানে হতে পারে না। দুটোর মধ্যে আশনাই আছে এ সন্দেহ তার আগেও হয়েছে।

অজানতে হাত চলে গিয়েছে পাশেরাখা হেঁসো দাখানার উপর।

রহিমের বউ জিজ্ঞাসা করছে—"তুই জুম্মার নমাজ সেরে আসছিস বুঝি মসজিদ থেকে?"

"না। পরবের দিন ছাড়া নমাজপড়া হয়ে ওঠে না, যাদের নিজের জমি নেই তাদের।"

"তোর যেমন কথা! মসজিদে জুম্মার নমাজ পড়ার সঙ্গে আবার জমি

থাকা না থাকার কি সম্বন্ধ? তোর ইচ্ছা করে না, যাস না; তার মধ্যে আবার সাত রকমের কথা কিসের!"

"আর যারা মজুরি খেটে খায় তারাই জানে যে জুম্মার নমাজের দাম সাত পয়সা।"

"না না, ওসব কথা বলতে নেই।"

"আরে, ওদাম কি আর আমি ফেলেছি। ওদাম ফেলেছে তোদেরই ইসমাইল বাধিয়া। একদিন জুম্মার নমাজের জন্য এক ঘণ্টা ছুটি নিয়েছিলাম। মজুরি দেবার সময় চৌদ্দ আনার মধ্যে থেকে সাত পয়সা কেটে নিয়েছিল।"

"সত্যি?"

"সত্যি, না তো কি মিছে কথা বলছি? তবে তুই বলেছিস ঠিকই। আমার মত লোকের দৌড় ওই পীরের টিলা পর্যন্তই। মেয়েরা যায় 'চিথরিয়া পীর'-এ ন্যাকড়া বাঁধতে দিনের বেলায়, আর আমি যাই মোষ চরাতে চরাতে রাত একটায়।"

হাসছে দুটোতে মিলে।

"চুপ কর বলছি বাকর।"

ওরা নিশ্চয়ই সাটে কথা বলছে, যাতে অপর কেউ শুনলেও বুঝতে না পারে। রাগে সর্বশরীর জ্বালা করে হাসান্নুর।......ইসমাইল মজুরী থেকে সাত পয়সা কেটে নিয়েছে বলে, বাকর জুম্মার নমাজ নিয়ে ওরকমভাবে কথা বলবে!...শরীরে এখন যে সে শক্তি নাই!

......সে কথা এই পিঁপড়েগুলোও বোঝে। তাই এসেছে জ্বালাতন করতে হাতে তালের গন্ধ পেয়ে!......একটা দুটো নয়। এ যে অনেক।...... চাটাই ভরে গিয়েছে!...গায়ের পিঁপড়ে ঝাড়তে ঝাড়তে হাসান্নু উঠে দাঁড়াল। ভাল করে লক্ষ্য করে সে দেখে।

...তাই বল! তালের গন্ধে আসতে যাবে কেন? ঝড়বাদল হবে নিশ্চয়ই। তাই বেরিয়েছেন শালারা!......

গা হাত পা থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে ছাড়াতে, সে কোনরকমে বাইরের দাওয়ায় এসে বসে। বাইরে রোদের তেজ কমে গেল কখন? তাকাতে কষ্ট

হচ্ছে না তো। মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হল। তবু মনের মধ্যে একটা সন্দেহ কিরকির করে বেঁধে। এদেশের ভাষায় 'চিথরিয়া পীর' মানে ন্যাকড়া-পীর। বাকর 'চিথরিয়া পীর'এ রাত্রিতে যাবার কথাটা বলল কেন? এখনও ওদের হাসিগল্প থামেনি।

"অত জোরে জোরে বলছিস-তোর শ্বশুর আবার হে'সো দিয়ে তোর জিভ না কেটে নেয়।"

"ওর ভয়ে তো পিঁপড়ের গর্ত খুঁজতে হবে। দিনরাত কী জ্বালাতন যে আমার হয়েছে ওকে নিয়ে! মুন্না তালের আঁটি চুষে ফেলে দিয়েছে উঠনে; সেটাকে নিতে গিয়ে খানিক আগে আছাড় খেয়ে পড়েছে। অষ্টপ্রহর খাই-খাই। কটা পাকা কদম ফুল এনে রেখেছিলাম, সব কটা রাত্রিতে খেয়েছে। একদিন দেখি একখণ্ড কাগজ চিবুচ্ছে। পচা, গলা, যে কোন জিনিস হলে হল, কিছু না পেলে নিজের মাড়ি চিবয়।"

"বুড়ো যাতে তাড়াতাড়ি মরে সেজন্য চিথরিয়া পীরে ন্যাকড়া বাঁধিসনা কেন?"

হাসছে দুজনেই।

"চিথরিয়া পীরে ন্যাকড়া বেঁধে যদি ওর পরমায়ু কমানো যেত, তাহলে বুড়ো অনেক আগেই খতম হত। তোর বাপ কি আর সেকালে পরখ করে দেখেনি?"

"দেখে থাকবে হয়ত। সেই ন্যাকড়া বাঁধার ধকেই বোধহয় তোর শ্বশুরকে নিয়ে জেলখানার ঘানি ঘোরাতে পেরেছিল।"

বারান্দায় হাসান্থর মাথা গরম হয়ে ওঠে আবার, এই মিথ্যা কথাটা শুনে। ...জেল তার হয়নি। তাকে বাকরের বাপ শীর্ষাবাদিয়া না বলে 'বাধিয়া' বলেছিল তাই তার জিভ কেটে নিতে গিয়েছিল হাসান্থ, হে'সো দা দিয়ে। মামলায় হাকিম জরিমানা করেছিল পঁচিশ টাকা। সে টাকাও 'বুড়হিয়া মেম' দিয়ে দিয়েছিল।...মিথ্যাবাদীর ঝাড়!......

আজ আর 'বাধিয়া' বললে এখানকার শীর্ষাবাদীয়ারা কেউ চটে না।

হাসান্থ জোরে জোরে কেশে পুত্রবধূকে জানিয়ে দিল যে সে বারান্দায় এসে বসেছে।

এখনকার মত ঢোঁড়াইর হাসিগল্প শেষ হল। কিন্তু তার চিন্তার শেষ নাই। বসে বসে ভাবা ছাড়া আর তো কোন কাজ নাই আজকাল।

যাক। মাথার দবদবানি কমে গিয়েছে গরমটা কাটবার সঙ্গে সঙ্গে। জলো হাওয়া দিচ্ছে অল্প অল্প। হাঁড়ি কিনে যারা বাড়ি ফিরছে, তারা বলে গেল—গঙ্গা আর কুশী কানায় কানায় ভরে উঠেছে—আর জল নিচ্ছে না—আর জল বাড়লে ঠেলবে উপরের দিকের নদীনালাগুলোতে। এ খবর নৌকা-ওয়ালার কাছ থেকে পাওয়া। বুড়ো সোজা হয়ে বসে। এই খবরহীন দুনিয়াতে এটা তবু একটা নতুন খবর। ধরে তাদের বসাতে চায়, এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করবার জন্য। কিন্তু সবাই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়। বুড়োর সঙ্গে বাজে কথা বলে কেউ সময় নষ্ট করতে রাজী নয়। ছুটে যেতে ইচ্ছা করে নৌকার কাছে; কতটুকুই বা দূর। কিন্তু নিজের ক্ষমতার উপর ভরসা পায় না। ভঁইসদিয়ারার কাশগাছগুলো দেখা যাচ্ছে কিনা এপার থেকে? তাহলেই আন্দাজ পাওয়া যায় জল কতটা বেড়েছে গঙ্গায়। জল বাড়লেই হরিণ-কোলের 'কুণ্ড'এর কাছে পশ্চিম থেকে ভেসে আসা শুকনো গাছের গুঁড়িগুলো অনবরত ঘুরপাক খেতে থাকে। হাঁড়ি-ওয়ালা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে সে জিনিস। জানতে পারলে হত!···

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হল। রহিমের বউ ছুটে এল নালার ধার থেকে, শুকতে দেওয়া চট, মাদুরগুলো তোলবার জন্য।

তারপর থেকেই চলল ছিপছিপে বৃষ্টি আর জলো হাওয়া।

রাত্রিতে কেউ ঠাহর করতে পারেনি। ভোর বেলাতে উঠে সকলে দেখে অবাক-কাণ্ড! এত জল সেওরা নদীতে কেউ জীবনেও দেখেনি। কান খাড়া হয়ে উঠেছে হাসাদুর। এ তো শুধু বৃষ্টিতে জল বাড়া নয়। এ যে অন্য রকমের একেবারে! নৌকাওয়ালা যা বলেছিল তাই। গঙ্গা মেরেছে ঠেলা। ঠেলছে জল ওপরের দিকে নালা বেয়ে। যা যা, ঘাটে নৌকাওয়ালাকে ভাল করে জিজ্ঞাসা করে আয়, এ জিনিস ঠিক তাই কিনা? আলবাত তাই! জিজ্ঞাসা করবার আর দরকার নাই!···

এমনিতেই রাত্রিতে আজকাল ঘুম হয় না। কাল রাতের অনিদ্রাটা আরও কিরকম যেন লেগেছিল। নিশ্বাসের সঙ্গে কি যেন একটা এড়িয়ে যাচ্ছে।

বলে বুঝানো যায় না এমনি একটা অস্বস্তি। হাওয়া বাতাসের শব্দ আর গন্ধ কি রকমের যেন। এতক্ষণে বুঝল। বুক কেঁপে উঠেছে তার। ছেঁড়া ছেঁড়া দলছাড়া কচুরিপানা আবার উলটো দিকে চলেছে। নালাটা নদী হয়ে উঠেছে। সে নিজে যেতে পারেনি তাই গঙ্গা উজিয়ে এসেছে তার দুয়ারে। তাই জলে বাতাসে ফেলে আসা স্বর্গের চেনাচেনা গন্ধ। বুকভরে টেনে সে নিশ্বাস নিল। শুষে নিতে চায় সে এই সোঁদা গন্ধটাকে; ঝাপসা চোখ দিয়ে গিলতে চায় উপচে-পড়া সেওরা নদীকে। বড় সুবিধা আজ রোদ নাই। হ্যাঁ নদীই তো। সেওরা নদী বাড়ুক, বাড়ুক, জল আরও বাড়ুক! গঙ্গা আরও ঠেলুক। ঝোঁকের মাথায় লাঠি না নিয়েই বারান্দা থেকে নেমে পড়ল সে, আরও কাছ থেকে দেখবার জন্য।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে পীরগঞ্জের লোকরা বুঝতে পারল যে ব্যাপারটা আর মজা দেখবার মত নাই। জল ক্রমাগত বাড়ছে একটু একটু করে। পাড় ডুবল, রাস্তা ডুবল, নীচু জায়গাগুলোর দিকে জলের স্রোত বইল; গেরস্ত-বাড়ির উঠনে জল গেল, সিঁড়ি ডুবল; গরুর খাবার নাদা ভাসল; ঘুঁটের মাচা ভাসল; উখলি ভাসল; বারান্দায় জল উঠল। এইবার ঘরের মটকায় জিনিস বেঁধে ভাবতে হল আশ্রয়ের কথা। গ্রামের মধ্যে উঁচু জায়গা, দুটি টিলা। এক টিলাব উপর মসজিদ, আর এক টিলার উপর চিথরিয়া পীরের নেকড়া বাঁধবার গাছ। কাজেই মসজিদে ছেলেমেয়ে বুড়োদের পাঠিয়ে দেওয়া হল। বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষরা এখনকার মত থাকল বাড়িতে, গাই বলদ, ঘরদুয়ার, জিনিস-পত্র সামলাবার জন্য, দরকার পডলে পরে যাবে মসজিদে।

সুবিধার মধ্যে সারাগ্রামে জল কোথাও বেশী নয়। নীচু জায়গাগুলোতে জল এক কোমর; অন্য জায়গায় হাঁটুজল।

হাসানু মসজিদে যাবার সময় হুঁকো আর লাঠিটা নিয়েছে। সে ধর্মপ্রাণ লোক; বহুদিন পর মসজিদে এসেছে; কিন্তু মন তার পড়ে রয়েছে অন্য দিকে। চারিদিকে থই-থই জল। মসজিদের টিলাটাকে মনে হচ্ছে যেন গঙ্গার বুকের চর। ঘাটের নৌকাখানা ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে। শঙ্খচিল বসেছে মসজিদের উপর। ছেলেরা মসজিদের সিঁড়ির নীচে কলাগাছের ভেলা তয়ের করছে। তাদের বাড়ির জিনিসপত্রের কি হাল হবে, সে সম্বন্ধে হাসানুর কোন দুশ্চিন্তা নাই।

মসজিদের বারান্দায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি কান্নাকাটি করছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ছোটছেলের হাত থেকে পড়ে যাওয়া গুড়ের টুকরো তুলে খাবার কথা আজ আর তার মনে আসছে না। সে অনর্গল কথা বলে চলেছে—ছেলের দল শুনুক আর নাই শুনুক।

…গঙ্গার মধ্যে দিয়ে স্টীমার চলে ভোঁ-ও-ও। ধোঁয়ার কুণ্ডলী হাওয়ায় উড়ে যায়, বকের সারের সঙ্গে সঙ্গে।…সে বানের জলের কী স্রোত! বড় বড় গাছ ভেসে যাচ্ছে। জ্যান্ত, মরা জন্তু জানোয়ার, মানুষ অগুনতি।…ঐ স্রোতের মুখ থেকে হরিণ ধরে আনতে যে-সে লোক পারে? সে পারত হাসান্থ শীর্ধাবাদিয়া।…রাতদুপুরে সে একা সড়কি দিয়ে দাঁতওয়ালা বুনোশুয়োর মেরেছে কতবার। একবার কাশের বনে তাকে দেখে কয়েকটা লোক নৌকার মধ্যে থেকে আঁতকে চীৎকার করে উঠেছিল—বুনোমোষ ভেবে।… গঙ্গার বুকের ঘূর্ণিজলে যেসব শুকনো কাঠ অনবরত ঘুরপাক খায়, সেইগুলোকে সে প্রত্যহ সাঁতরে নিয়ে আসত জ্বালানি করবার জন্য।…দশটা বন্দুকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের দল একবার একটা চর দখল করেছিল। সে যে কী কাণ্ড!…

হাসান্থ বলে চলেছে নিজের মনের তাগিদে। মনে মনে না ভেবে মুখের কথার মধ্যে দিয়ে ভাবা। বড় নদীর বুকের উপরের জীবন আবার তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।…মাথায় আজ আর তার ঠাণ্ডা তেলের দরকার নাই; চলবার সময় লাঠির দরকার নাই; মেঘলা না থাকলেও আজ বোধহয় দিনের বেলায় বাইরে তাকাতে তার কষ্ট হত না। শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে আনবার ফুরসত নাই। কতকাল আগেকার হারিয়ে যাওয়া মন ফিরে পেয়েছে সে আবার। রহিমের বউ এসেছিল মুন্নাকে দেখতে। ছেলেকে দেবার পর শ্বশুরের হাতেও একটু গুড় দিতে গেল। আজ প্রথম হাসান্থ এ রকমভাবে ছোটছেলের মত হাত পেতে গুড় নিতে লজ্জা পেল। পুত্রবধূর কাছ থেকে সে জানতে পারল যে রহিমরা গিয়েছে থানাতে, পীরগঞ্জের দুরবস্থা দারোগাকে বুঝিয়ে বলবার জন্য। হাঁড়িওয়ালার নৌকাতে গিয়েছে।

হাসান্থ মনে মনে হাসে; এরা কখনও বানের জল দেখেনি কিনা, তাই ঘাবড়ে গিয়েছে। লুঠতরাজও নয়, দাঙ্গাহাঙ্গামাও নয়; এর মধ্যে দারোগা করবে কি? হাত দিয়ে বানের জল আটকাবে? নৌকাওয়ালাদের রাজী

কয়িয়ে কাল সেও বার হবে বানের জল দেখতে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে ফিরতিমুখো নৌকাখানাকে দেখবার প্রতীক্ষায় ছিল। দেখতে পায়নি। বোধহয় কাল ফিরবে তাহলে। ছেলের বউকে হাসান্থ বিশ্বাস পায় না। ও-ই ইচ্ছা করে পাঠায়নি তো থানায় রহিমকে? কিছু বলা যায় না।

ছেলেদের সঙ্গে গল্প করবার উৎসাহ ক্রমে মিইয়ে আসে।...ওরে তোরা গাঙশালিখের বাসা দেখিসনি তো গঙ্গার পাড়ের?...নদীর ঢেউয়ের কিলবিলু-নির উপর রোদ ছিটকে পড়তে দেখেছিস কোনদিন?...ঢেউভাঙ্গা ফেনা কখন কখন হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়েছিস?...তোদের যদি সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় একবার, তবে হাওয়া বাতাসের গুণে ঠাণ্ডা রক্ত দেখতে দেখতে গরমে উঠবে। দেখিস না, শীতে আধমরা সাপ গরম বাতাস পেলে হঠাৎ কিলবিল করে ওঠে। সেইরকম।...

বলতে বলতে আনমনা হয়ে যায় হাসান্থ। চিথরিয়া পীরের দিকে তাকিয়ে দেখে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। গাঁয়ের বাড়িগুলোর দুই একটা আলো শুধু দেখা যায়।

ছেলেপিলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে মসজিদের বারান্দায়। কত রাত হল ঠিক বোঝা যায় না। জলো হাওয়া দিচ্ছে। বানের জলের বুকে অন্ধকার জমাট হয়ে চেপে বসেছে। মনের আঁধারও বাড়ছে।

...বড় হালকা স্বভাব রহিমের বউটার!...যত ভাবে তত মাথা গরম হয়ে ওঠে।...পরিবারের ইজ্জতের প্রশ্ন। আজকের হাসান্থ, গঙ্গার চরের দুর্দান্ত হাসান্থ শীর্ষাবাদিয়া। এ হাসান্থ বাড়ির ইজ্জতের প্রশ্নে গোঁজামিল রাখতে চায় না। ভিজে মৌসুমী বাতাস সাহারার 'সিমুম' ঝড়ের কঠোর পরোয়ানা বয়ে আনে। শিরায় উপশিরায় ঝিমিয়েপড়া হাবসীরক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মসজিদের সিঁড়িতে নতুন করে ধার দিয়ে হেঁসোর ফালাটার উপর একবার বুড়ো আঙুল বুলিয়ে নিল হাসান্থ। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবার ধৈর্য থাকে না। তার শিথিল পেশীগুলো কোথা থেকে আজ এত শক্তি পাচ্ছে কে জানে! মসজিদের সিঁড়ির নীচ থেকে ছেলেদের কলাগাছের ভেলাটি নিয়ে, সে বেরিয়ে পড়ে। বাঁশের লাঠিটা লগির কাজ করছে। নিজের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে আজ সে সংশয়হীন। যত অন্ধকারই হক, শীর্ষাবাদিয়াদের জলের মধ্যে

দিগ্‌ভ্রম হয় না। 'চিথরিয়া পীর' কতটুকুই বা দূর। লগি ঠেলবার সময় একটুও যাতে শব্দ না হয় সে বিষয়ে সে সজাগ আছে। এত তাড়াতাড়ি শ্রান্ত হয়ে পড়বে তা সে ভাবেনি। দেহ শ্রান্ত হলে কি হবে, মাথা বেশ পরিষ্কার আছে। টিলা থেকে খানিক দূরেই ভেলা ছেড়ে দেওয়া উচিত একথা সে জানে। সামান্য অনবধানতায় শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এ সুযোগ প্রত্যহ আসবে না। কয়েকটা গরুমোষ জল ছপছপ করতে করতে চলেছে পাশ দিয়ে। অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বলছে। হাসানু বোঝে যে এরা যাচ্ছে উঁচু জায়গার দিকে। চিথরিয়া পীরের টিলা কাছেই। ভেলা ছেড়ে দিয়ে, এদেরই সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে ওঠে ডাঙ্গায়। হাঁপাতে হাঁপাতে সে থকথকে কাদার উপরই বসে পড়ে।...না, কাদা না, গোবর। চারিদিকে অগণিত চোখ জ্বলছে। এত গরুমোষ যে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে সে ভাবতে পারেনি।

চিথরিয়া পীরের বিরাট গাছটা তার সম্মুখে। জোনাকপোকা জ্বলছে নিভছে। গাছে বাঁধা সাদা ন্যাকড়াগুলো অন্ধকারে যেরকম দেখা যাওয়া উচিত ছিল সেরকম দেখা যাচ্ছে না, বোধহয় বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে বলে। গরুমোষগুলো গাছতলায় যাবার জন্য ঠেলাঠেলি করছে। গাছের গুড়ির কাছেই ঠেলাঠেলিটা সব চেয়ে বেশী। গলা বাড়িয়ে নীচু ডাল থেকে পাতা খাবার চেষ্টা করছে। ওইসব ডালগুলোতেই ন্যাকড়া বাঁধা থাকে বেশী, সেইগুলোকেই হয়ত টেনে নামাবার চেষ্টা করছে খিদের জ্বালায়!...তাকে মারবার জন্য ন্যাকড়া বাঁধতে সলা দিয়েছিল রহিমের বিবিকে বাকরটা!...

হঠাৎ গাছের উপর একটা আলো জ্বলে উঠল। বুক কেঁপে উঠেছে ভয়ে। বুড়ীমেম নাকি। না, মানুষ! বিড়ি ধরাচ্ছে দিয়াশলাই দিয়ে। সেই শালা। যেটা জুম্মার নমাজের দাম সাত পয়সা ফেলেছিল। শক্ত মুঠোয় সে ধরেছে হেঁসোর হাতলটা।.. শালা গাছে উঠে লুকিয়ে বসে প্রতীক্ষা করছে সেই বদ মেয়েমানুষটার! ইচ্ছা হয়, ছুটে গিয়ে এখনই ওটাকে টেনে গাছ থেকে নামায়! অতি কষ্টে সে নিজেকে সংযত করে, দুটোকে এক সঙ্গে ধরবে বলে। উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপছে তার। মোষের আড়ালে থাকলেও নড়তে চড়তে ভয় হয়, পাছে গাছ থেকে বাকর আবার দেখে ফেলে তাকে।

মশা কামড়ালেও হাত নাড়াবার উপায় নাই। পাশের গরুটা মুখচোখের উপর অনবরত ভিজে লেজের চামর দোলালেও কিছু বলবার উপায় নাই!

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। জলের মধ্যে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ! আরও গরুমোষ আসছে বুঝি। না, সে আওয়াজ অন্যরকমের।

এ মানুষ! হাসানু কান খাড়া করে রাখে।...এগিয়ে আসছে। একজন তো? অন্য কেউ না তো?

"কিরে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?"

রহিমের বিবির গলা। আর কোন সন্দেহ নাই। গরুমোষগুলো ঠেলাঠেলি করছে, ওই আওয়াজটা যেদিক থেকে এল সেইদিকে যাবার জন্য। হাসানুর পা মাড়িয়ে চলে গেল একটা গরু; সেদিকে তার খেয়াল নাই। অন্ধকারে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ বুঝি ফেটে গেল তার।...আসছে সেই মাগী!...

গাছের উপর থেকে বিকৃত মিহি গলায় একজন বলল—"হামি বুড়িয়া মেম আছি।"

আবার সেই খিকখিক করে গা-জ্বালানে হাসি রহিমের বিবির!

গরুমোষের দলের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছে।

"হট্! হট্!"

গরু তাড়াতে তাড়াতে রহিমের বউ এসে উঠল ডাঙ্গায়। হাসানু শীর্ষাবাদিয়া কখন গরুমোষ ঠেলে পুত্রবধূর দিকে আগিয়ে গিয়েছে তা সে নিজেই জানে না।...একটা অতিকায় কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের মত কি যেন আসছে তার দিকে। মুখ চোখে সে একটা কিসের যেন ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আঘাত জোরে নয়; ঘষটানি গোছের।

"কী পিছলে পড়ে গেলি?" বলেই সেই খিকখিকে হাসি। পিছনে আর একজন কে আসছে। তার মাথায়ও এইরকম একটা বিরাট বোঝা।

গাছের লোকটা বিকৃত গলায় বলল—"বুড়িয়া মেমকে বড় পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে।"

মূহূর্তের বিস্ময়। কে? কী? কীরে?

চেঁচিয়ে উঠেছে রহিমের বউ, চীৎকার করছে পিছন থেকে রহিম, প্রশ্ন করছে গাছ থেকে বাকর; বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছে হাসান্থ।

"তুই না থানায় গেছলি" বাপ জিজ্ঞাসা করে ছেলেকে।

"হ্যাঁ, দারোগাবাবু নৌকা ছাড়ল না। বানের সময় নৌকার দরকার তাঁর। তাই আমরা ভেলায় করে ফিরে এসেছিলাম।"

এখানকার ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝতে বেশ একটু সময় লাগল হাসান্থর। গরুমহিষের খাদ্য ভুট্টা গাছের বোঝা, বানের হাত থেকে বাঁচিয়ে উঁচুতে রাখবার জন্য, এরা এনে জমা করছে এখানে। বাকর সেগুলোকে গাছের উপর রশি দিয়ে বেঁধে বেঁধে রাখছে। নইলে গরুরা কি নীচে রাখতে দেয় খাওয়ার জিনিস এখন! এরা আগেও বার কয়েক স্বামী-স্ত্রীতে ভুট্টাগাছের বোঝা বয়ে বয়ে এনেছে এখানে। আরও আনতে হবে।

হাতের মুঠি শিথিল হয়েছে হেঁসো দার হাতলে। 'চিথরিয়া পীরের' আকাশে বাতাসে গঙ্গার বালুচরের পরিচিত গন্ধ।

ছেলে বউয়ের জেরার উত্তরে, এই রাত্তিতে 'চিথরিয়া পীরে' আসবার একটা কারণ হাসান্থকে খুঁজে বার করতেই হল।

হেঁসো দিয়ে নিজের লুঙ্গির কোণা থেকে একটা লম্বা ফালি কেটে নিয়ে সে পুত্রবধূর হাতে দেয়।

"স্বামীর গায়ের দাদ সারাবার জন্য মানত করে বাঁধ ন্যাকড়াটা গাছে! খুব উঁচুতে বাঁধিস; নইলে এই উটের মত গরুগুলো, এখনই টেনে খেয়ে ফেলবে।"

॥ স্বর্গের স্বাদ ॥

যে চুল্লীগুলোতে ঘোড়ার মাংস রাঁধা হচ্ছে তার চতুর্দিক লোকে লোকারণ্য। স্থানীয় আবালবৃদ্ধবনিতা কেউ বোধহয় বাদ নাই। দর্শকদের মধ্যে রবাহূত, অনাহূত, পথিক, পরদেশী সকলেই আছে। দেবতাদের দিবার পর, পাক-করা অশ্ব-মাংস উপস্থিত সকলকে খেতে দেওয়া হয়। যজ্ঞবাড়ির লোকরা আহার করে সর্বশেষে। তাই এত ভীড়। দর্শকদের সকলেরই গায়ের রঙ ফরসা; নাক টিকালো। পুরুষরা সকলেই সশস্ত্র। পথিকদের চেনা যাচ্ছে তাদের কাঁধের চর্মনির্মিত সুরাভাণ্ড থেকে। ক্ষোণী নামক বাদ্য-যন্ত্র যার হাতে, সে বোধহয় ভিক্ষুক। আকাশে কাক চিল উড়ছে। দূর থেকে বিকট হ্রেষাধ্বনি অবিরাম শোনা যাচ্ছে। গ্রামের সমস্ত ঘোড়াগুলোকে একটু দূরে এক জায়গায় বেঁধে রাখা হয়েছে। ঘোড়ার রক্তের গন্ধে তারা ভয় পায়। হাতে-লাঠি যে দীর্ঘকেশ ব্যক্তিটির উপর কুকুর তাড়াবার ভার পড়েছে, তার নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নাই। মাংসের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। কতকগুলি ভাণ্ডে মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। আর একদিককার অগ্নিকুণ্ডে শূলে আবদ্ধ মাংসখণ্ড ঝলসান হচ্ছে। বসা, মজ্জা গলে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ছে আগুনের মধ্যে। লোকে কাছে গিয়ে তার গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে উপভোগ করতে চায়। ছেলেপিলেদের ঠেকিয়ে রাখাই সবচেয়ে শক্ত। তারা চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিয়েছে। এতক্ষণ তারা ছিল, যেখানে ঘোড়ার মাংস কেটে খণ্ড খণ্ড করা হচ্ছে, সেইখানে। এখনও একটা ঘোড়ার দেহ সেখানে ঘাসের উপর পড়ে রয়েছে। আকাশের কাক চিলের লক্ষ্য সেই দিকেই। মাছি ভন ভন করছে চতুর্দিকে। দুইজন মিলে ঘোড়ার ছাল ছাড়াচ্ছে। একজন স্তূপীকৃত নাড়িভুঁড়িগুলোকে সযত্নে পরিষ্কার করতে বসেছে। এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বেতস-শাখা দিয়ে অশ্বদেহ চিহ্নিত করে দিলেন। ওই দাগ অনুযায়ী কাটতে হবে। কিন্তু মাছির জ্বালায় কিছু কি সুস্থির হয়ে করবার জো আছে!

যে সদা-হাস্যমুখ বৃদ্ধটি ঘুরে ঘুরে অগ্নিকুণ্ডগুলিতে সমিধ যোগাচ্ছেন, তাঁর চেহারা এত লোকজনের মধ্যেও সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁর মাথা-জোড়া টাকের জন্য। এমন মসৃন এবং সর্বব্যাপী টাক সচরাচর দেখা যায় না। চুল্লীর আগুনের ঝিলিক লেগে আরও চকচকে দেখাচ্ছে। তাঁর আসল নাম অত্রি, কিন্তু গ্রামের লোকে তাঁর নাম দিয়েছে ইন্দ্রলুপ্ত। এই নামে ডাকলে কিংবা তাঁর ইন্দ্রলুপ্ত নিয়ে উপহাস করলে এই সদাশিব ঋষি কখনও রুষ্ট হন না। তাঁর অবুঝ মেয়ে এর জন্য ব্যথা পেলে তিনি কত সময় বোঝান, যে দরিদ্রদের এত স্পর্শাতুর হওয়া সাজে না। মেয়েটা বুঝতে চায় না। আরে, দুটো লোক যদি তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করে আনন্দ পায় তো পেতে দে না!

গ্রামের সর্বাধিক গোধন, ও সর্বশ্রেষ্ঠ শস্যক্ষেত্রের অধিকারী গল্পুর বাড়ির দশমাসব্যাপী ইন্দ্র-যজ্ঞ আজ শেষ হ'ল। তাই আজ সেখানে এত সমারোহ। দশ মাস থেকে গ্রামের লোকে এই দিনটির প্রতীক্ষা করছিল। এখন দুইদিন ধরে এখানে খাওয়া-দাওয়া চলবে। আজ সোমরস ও অশ্ব-মাংসের ভোজ; কাল হবে অপূপ, পুরোডাশ, পক্তি, দধি ও ক্ষীরের ভোজনোৎসব।

দলে ভারী হলে কিশোরদের প্রগল্‌ভতা বাড়ে। একটি প্রগল্‌ভ কিশোর অত্রির টাকের দিকে তাকিয়ে নিজের কেশপ্রসাধন করবার ভঙ্গী দেখাচ্ছে। ভাবখানা যে টাকের আয়নায় সে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে। তার অঙ্গভঙ্গী দেখে দর্শকরা হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে। মাংস-পাকরত এক প্রবীণ ব্যক্তি অত্রিকে বলেন—"ইন্দ্রলুপ্ত, দেখছ তো সব?"

"হ্যাঁ দেখছি বইকি। শুনছিও সব। প্রতিবেশী আর তালুকীট উভয়কেই প্রতিবাদ করা বৃথা।"

অত্রি হাসছেন। দর্শকরা নূতন করে হাসির খোরাক পেল। চারিদিক থেকে রব উঠল 'ইন্দ্রলুপ্ত'! 'ইন্দ্রলুপ্ত'! অত্রি হাসতে হাসতে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন —"মরুভূমি। আমার শস্যক্ষেত্রে পুঁতি যব, হয় কাঁটাগাছ। এবার একবার ভাবছি কাঁটাগাছ লাগিয়ে দেখি,' কী হয়। আমার এই ইন্দ্রলুপ্তের মতনই, আমার ক্ষেত। দুটো দর্ভতৃণ জন্মালেও মোষটাকে চরাতে রাতদুপুরে অরণ্যে যেতে হ'ত না; দুটো মুঞ্জতৃণ জন্মালেও সোমরস শোধন করবার কাজে লাগত; দুটো শরের ঝাড় জন্মালেও জীর্ণ কুটির সংস্কারের সময় আর্জীকীয়া নদীতীরে

ছুটতে হত না। মরুভূমিতে বৃক্ষোদ্গম করবার চেষ্টা করাও যা, আর এই ইন্দ্রলুপ্তে কেশোদ্গম করবার চেষ্টা করাও তাই।”

“সে চেষ্টা কি আর করেননি যৌবনে?”

“হ্যাঁ, নিজের অভিজ্ঞতার কথাই তো বলছি।”

হেসে উড়িয়ে দিতে চান অত্রি প্রতিবেশীদের ঠাট্টা বিদ্রূপ। তবু কানে আসে খুচরো টীকা টিপ্পনি।

“অনুর্বর ভূমিতে তবু তো কাঁটাগাছ জন্মায়, কিন্তু ইন্দ্রলুপ্তের যোজন-বিস্তারী মরুভূমি যে মসৃন শিলার মত।”

সকলের উচ্চ হাস্যে তিনি নিজেও যোগ দেন। এইটাই অত্রির আত্মরক্ষার কৌশল। অপালা কাছাকাছি কোথাও নাইতো? তিনি একবার লোক-জনের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন। দেখতে পেলেন না অপালাকে। না থাকলেও ভাল। গঙ্গুর গৃহাভ্যন্তরে পাড়ার মেয়েরা যেখানে অক্ষক্রীড়ায় মত্ত, সে বোধহয় তাহলে সেইখানে। ওই মা-মরা অভিমানিনী মেয়েটিকে নিয়েই অত্রির যত দুশ্চিন্তা। নিজের দারিদ্র্যের জন্য তিনি ভাবেন না—তিনি আর কত দিনই বা বাঁচবেন; কিন্তু মেয়েটির সারা জীবন যে এখনও সম্মুখে পড়ে। অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জামাই নেয় না। বিয়ের পর একবার দিনকয়েকের জন্য অপালা পতিগৃহেও গিয়েছিল; কিন্তু একটা ত্বকরোগের জন্য তার দেহ সম্পূর্ণ নির্লোম বলে, জামাই তার সঙ্গে ঘর করতে অস্বীকার করে। সেই থেকে পিতার কাছে আছে। পতি-পরিত্যক্তা বলে পাড়ার মেয়েরা তাকে খোঁটা দেয় এবং অমঙ্গলে বলে ভাবে। চর্মরোগ ও লোম-শূন্যতার জন্য সকলে তাকে নিয়ে উপহাস করে। বৃদ্ধ অত্রি আর কত আড়াল করে রাখতে পারেন তাকে! তবু তো এখনও তিনি বেঁচে আছেন; তিনি গেলে যে মেয়েটার কপালে কী আছে সে কথা ভাবতেও ভয় পান অত্রি। মানুষের সঙ্গে তবু লড়াই করা চলে, কিন্তু দেবতাদের কাছে যে স্তবস্তুতি ছাড়া আর কোন উপায়ই নাই! অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ আদি ত্রয়স্ত্রিংশ দেব যদি শত যজ্ঞস্তুতি সত্ত্বেও তাঁর উপর বিরূপ থাকেন, তবে তাঁর মত সামান্য মানুষ কতটুকু কি করতে পারেন! তাঁদের তুষ্ট করতে পারেননি এ তাঁর অক্ষমতা; এর জন্য অন্য কাউকে দায়ী তিনি করেন না।

বালকবালিকারা স্বভাবত বড় নির্দয় হয়। যে যত দুর্বল, তত তার পিছনে লাগতে ভালবাসে তারা। সেজন্য অত্রি অন্তর থেকে চান না যে তাঁর মেয়ে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে বেশী আসে। কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে সব সঙ্কল্প বজায় রাখা শক্ত। তাঁর শস্যক্ষেত্র অনুর্বর। কর্মক্ষমতা কম। দুই বেলা দুই মুঠো ভৃষ্টযবের সংস্থান করাও তাঁর পক্ষে শক্ত। দানে প্রাপ্ত একটা গরু, ও একটা মহিস আছে বলেই কোন রকমে কায়ক্লেশে দিন কেটে যায়।

এক প্রবীণ কর্মকর্তা হাঁক পাড়লেন—"ইন্দ্রলুপ্ত! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? ওদিককার চুলোটাতে একটু আঁচ ঠেলে দাও!"

হন্তদন্ত হয়ে অত্রি ছুটলেন সেইদিকে।

চুল্লিতে চড়ান পাত্রগুলো থেকে রাঁধা মাংসের সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। পাক-রত ব্যক্তিরা দর্শকের প্রশ্নবাণে ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। যজ্ঞকর্তা গঙ্গু ও তাঁহার স্ত্রী একবার নিজেরা এসে করজোড়ে দর্শকদের রন্ধন স্থান থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করে গেলেন। অপর এক ব্যক্তি এসে উচ্চকণ্ঠে সকলকে জানিয়ে গেলেন যে এক বৃক্ষতলে দ্যূতক্রীড়া হচ্ছে; সেখানে ক্ষোণী ও কর্করি বাদ্যেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কে কার কথায় কান দেয়। ভিড় পাতলা হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

ইতোমধ্যে দর্শকদের মধ্যে থেকে কে একজন যেন পাচককে বলল—"মাংস সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে; এইবার নামিয়ে ফেলুন।"

বামা-কণ্ঠস্বর। চমকে উঠেছেন অত্রি। অপালার গলা। উৎসাহের অতিশয্যে বলে ফেলেছে অপালা কথাটা। তার ধৃষ্টতায় অবাক হয়ে সকলে তাকিয়েছে তার দিকে। অযাচিত উপদেশে রুষ্ট হয়ে পাচক বলে—দেবতাদের দেবার আগে তোমাকেই দিই, কি বলো?

"দাও এক হাতা গরম ঝোল ওর জিভের উপর ঢেলে!"

"হ্যাঁ,নোলায় ছেঁকা দেওয়া দরকার এই চিরশিশুটির!"

"শুধু নোলায় নয়, গায়ের চামড়াতেও। গায়ের এ চামড়া উঠে গেলে, এক যদি ওর নীরোগ চামড়া গজায়!"

"কৃষ্ণ নামক অসুরের কালো চামড়া ইন্দ্রদেব যেমন করে ছাড়িয়ে ফেলেছিলেন, তেমন যদি করেন আবার, তবেই ও রোগ সারতে পারে, নইলে নয়।"

এসবই মেয়েদের গলা।

উচ্চ হাসির রোল ওঠে। গঙ্গুরপত্নী একবার অপাঙ্গে অত্রিকে দেখে নিয়ে সকলকে থামতে বলেন! প্রয়োজনের চেয়েও অধিক মনোযোগ দিয়ে অত্রি উননের আঁচ ঠেলতে আরম্ভ করেছেন তখন। ইচ্ছা হয় একবার দেখেন অপালা এখন কী করছে; কিন্তু কুণ্ঠায় লোকজনের দিকে তাকাতে পারেন না।

অপালা অপ্রস্তুত হয়েছে বিলক্ষণ। তার চোখ ফেটে জল আসছে। পরিহাসগুঞ্জনরত লোকজন ঠেলে, সে কোন রকমে বাইরে বেরিয়ে আসে। যা ভয় করা যায়, ঠিক কি তাই হবে! এই ভয়েই সে সব সময় তটস্থ হয়ে থাকে।

বিমনা হয়ে পড়েছেন অত্রি; চেনেন তো নিজের মেয়েকে। ঘা খেয়ে খেয়ে ওর স্বভাবটাই গিয়েছে বদলে। একটু লোকজনের সঙ্গ এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়ায়। সব সময় ভয় পাচ্ছে আবার কেউ ওকে কিছু বলে। কিছু না বললেও অনেক সময় অপালা মনে করে নেয় যে তার রোগ নিয়েই বুঝি সকলে উপহাস করছে। দিন দিনই কেমন যেন একটু অধীরা হয়ে পড়ছে। কথায় কথায় চোখে জল। একবার যজ্ঞকালে প্রতিবেশী শুনঃশেপের পত্নী এবং আরও কয়েকজন রমণী প্রস্তর-নিষ্পীড়িত সোমলতা কলসের মুখে স্থিত মেষলোমের ছাঁকনিতে ঢালছিলেন। তখন অপালাকে কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন। যেখানে সোম অভিযুত হয় সেখানে বাজে কথা বলা বারণ; সেজন্য নাকি তাকে সেখান থেকে অঙ্গুলি সঙ্কেতেই চলে যেতে বলেছিলেন। কুটিরে ফিরে সেদিন তার কী কান্না! কত বোঝাই। অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করতে বলি। তাঁদের কৃপার কত দৃষ্টান্ত দেখাই। কক্ষীবান-দুহিতা ঘোষার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করবার কথা, খেলরাজার স্ত্রী বিশপলার যুদ্ধে ছিন্ন পা সারিয়ে দেবার কথা, নপুংসক নারী বধ্রিমতীর পুত্রবতী হবার কথা, নৃষদ-পুত্রের শ্রবণশক্তি ফিরে পাবার কথা, সব কথা তাকে বলি। নাসত্যদ্বয়ের অনুগ্রহ হলে কোন্ রোগ না সারে। অপালা কোন কথা বলে না। সব শোনে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। দেবতাদের অনুগ্রহের উপর ভরসা রাখতে বলা ছাড়া আর কী সান্ত্বনা দিতে পারি তাকে। সেইদিন থেকে কোন যজ্ঞ-বাড়ির সোমাভিষব স্থলে সে আর যায় না। পাথরে থেঁতলানো সোমপাতা

মেয়েরা দশ আঙ্গুলে না চটকে দিলে শুদ্ধ হয় না; কিন্তু ওকাজে অপালাকে কেউ কোনদিন হাত দিতে দেখেনি আর। এত অভিমানিনী সে। আরে, কার উপর অভিমান করিস!

অত্রির তখন ভোজবাড়ি থেকে নড়বার উপায় ছিল না। কুটিরে ফিরলেন রাত্রি দ্বিপ্রহরেরও পরে! অনুমান করেছিলেন যে মেয়ে কিছু খাইনি। সেইজন্য যজ্ঞবাড়ী থেকে একটি চর্মপাত্রে কিছু করম্ভ এবং আর-একটি আধারে খানিকটা সোমরস নিয়ে এসেছিলেন তার জন্য। মেয়েকে ভালভাবে চেনেন বলেই, তার জন্য গঙ্গুর বাড়ীর অশ্বমাংস আনেননি। এসে দেখেন যে অপালা তখনও বাড়ী ফেরেনি। তবে কি সে রাত্রি জেগে গঙ্গুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে মেয়েদের দ্যূতক্রীড়া দেখছে? মনে তো হয় না। বোধহয় যজ্ঞবাড়ীতে কোথাও বসে গল্প করছে মেয়েদের সঙ্গে। নিশ্চয়ই কুটিরে ফিরে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। ভয়ডর তার চিরদিনই কম। রাত্রিতে একলা চলাফেরা করবার মত সাহস তার আছে। সেই রকম শিক্ষাই সে পেয়েছে ছোটবেলা থেকে। অত্রি সযত্নে মেয়েকে ধনুর্বিদ্যা ও অসিচালনা বিদ্যা শিখিয়েছেন। তবু তিনি মেয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। নিশ্চয়ই সে অভুক্ত আছে এখনও। যার পতির গোশালায় সহস্র গোধন, তাকে আজ ভাগ্যবিড়ম্বনায় খাদ্যলোলুপ বলে উপহাস করে নিমন্ত্রণ বাড়ীর লোকে! কেন যে সে দেবানুগ্রহে বঞ্চিত, সে কথা কেবল দেবতারাই বলতে পারেন!

আর অপালা—সেই যে যজ্ঞবাড়ী থেকে বেরিয়েছিল, তারপর সোজা চলেছে গ্রামের বাইরের অরণ্য পথ ধরে। এই অরণ্য পার হলে আর্জীকীয়া নদী। নিমন্ত্রণ বাড়ীর কোলাহল, কর্মব্যস্ততা ও সমারোহ মুহূর্তের মধ্যে বিষ হয়ে উঠেছিল তার কাছে। লোকসংসর্গ ছেড়ে, যেখানে দু'চোখ তাকে নিয়ে যায় সেখানে সে চলে যেতে চায়। তার দেহ-ত্বকের প্রতি সকলের পরিহাস-কুতূহলী অপাঙ্গ দৃষ্টিতে অপালার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। এত সুন্দর পৃথিবী, এমন উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, সব অন্য লোকদের জন্য। সবাই বেশ আছে। দেবতাদের তো কথাই নাই! তরুণী রোদসী তাঁর স্বামী মরুৎগণের সঙ্গে পালাক্রমে আলিঙ্গন করতে পান; শত কাজের মধ্যেও দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের ও তাঁদের পোষা শাখামৃগটাকে নিয়ে হাস্য-পরি-

হ্রাসের সময় পান; দূরে চক্রবালে আকাশ, পৃথিবীর সঙ্গে নির্জনে মিলনের সুযোগ পান। শুধু মানবী অপালার জন্য নিয়ম আলাদা।

পথ চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আরম্ভ হ'ল শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য। এর মধ্য দিয়ে একটা পায়ে চলার পথ গিয়েছে নদী-তীর পর্যন্ত। ও পথে আজ প্রহরারত প্রতিবেশী আছে, যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস দস্যু ও অন্যান্য কৃষ্ণচর্মধারী লোকদের গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্য। সেজন্য অপালা ওই পথ এড়িয়ে চলল এখন। কৃষ্ণচর্মধারী দস্যুদের সে ভয় পায় না। কেননা তারা যে পুরুষ মানুষ। বয়সে যুবতী হলেও সে পুরুষ মানুষকে ভয় পাবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। চাঁদ উঠছে আকাশে। ঘোলাটে জ্যোৎস্না, আর মিশকালো গাছের পাতার ছায়া জাল বুনে চলেছে অরণ্যভূমিতে। গুমট গরম। একটা গাছের পাতা নড়ছে না। রাত্রিতে পথ চলতে হলে লোকে কত মন্ত্রোচ্চারণ করে, কত নাম স্মরণ করে। কিন্তু শৃঙ্গধারী পশুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আজ অপালা অগ্নিদেবকে স্মরণ করল না। সর্প বৃশ্চিকাদির বিষ থেকে রক্ষা পাবার জন্য শকুন্ত, নদী, ময়ূর, ও নকুলকে স্মরণ করল না। বিষধরের বিষকে মধুবিদ্যা দ্বারা অমৃতে পরিবর্তিত করবার জন্য সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা জানাল না। প্রতিবেশিনীদের রসনার পরিহাস-বিষ, নিরসক্ত পুরুষের চোখের কৌতুহল-বিষ, ও উদাসীন পতির চাহনির উপেক্ষা-বিষে যে জর্জর, সে কি কখনও সাপের ছোবলে ভয় পায়! এ অরণ্য তাদের এত জানা যে পথ হারাবার ভয় নাই। ধ্রুবতারা যেদিকে, সেদিকে সোজা গেলে আর্জীকীয়া নদী পাওয়া যাবেই যাবে, কোন না কোন স্থানে। পাথরে হোঁচট লাগছে, পায়ে কাঁটা ফুটছে, কণ্টক গুল্মে দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন একটু মরিয়া হবার আবেশ এসেছে তার। ঠিক কার উপর রাগ করে, তার এই নিজেকে কষ্ট দেওয়া, সে কথা নিজেও সঠিক জানে না।

বনের মধ্যের এক গাছতলায় গিয়ে অপালা থামল। জায়গাটা পরিষ্কার। গোচারণে বা সমিধ-সংগ্রহে এসে জনপদের লোকেরা এই বৃক্ষতলেই বিশ্রাম করে। গাছের গুঁড়িটা আর্য বালকদের শরসন্ধান অভ্যাসের কল্যাণে ক্ষতবিক্ষত। শ্রান্ত অপালা এখানে একটু বিশ্রাম করতে চায়; এখানে বসে সে এখন একটু আকাশপাতাল ভাবতে চায়। বসতে গিয়ে প্রথম বুঝতে পারল, যে অরণ্যপথে

আসবার সময় তার দেহের বস্ত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। অতসী-তন্তু দিয়ে বোনা বস্ত্র তার এই একখানিই। গৃহকর্মের বল্কল-বেশ ত্যাগ করে নিমন্ত্রণবাড়িতে যাবার সময় এই কাপড়খানা পরেছিল। কতদিন পরে আবার একখান ক্ষৌমবস্ত্র যোগাড় করে উঠতে পারবে, কে জানে। অথচ লোকালয়ে থেকে ঋত, যজ্ঞ স্তুতি ও প্রার্থনার জীবন বজায় রাখতে গেলে, ক্ষৌমবস্ত্রের প্রয়োজন প্রত্যহ। যে সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের যজ্ঞে প্রচুর সুবর্ণ, গো, এবং হবি ব্যয়িত হয়, দেবতারা কি শুধু তাঁদেরই উপর সন্তুষ্ট? সম্পূর্ণ নিয়মানুগা হয়ে, নিষ্ঠার সঙ্গে, সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দে কত স্তুতি জানিয়েছি ইন্দ্রদেবকে! হে অভীষ্ট-বর্ষী মেঘবাহন! তুমি পঞ্চক্ষিতির সর্বপ্রকার ধনের অধিপতি, তোমার দানশীলতার খ্যাতি শিশুকাল থেকে আমাদের কণ্ঠস্থ; তবে তুমি আমাদের বেলায় এমন কৃপণ কেন? বলো! আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। বজ্রনির্ঘোষে উত্তর দাও। তুমি নীরব। অশ্বিদ্বয় বধির। কতকাল থেকে কত প্রার্থনা জানিয়েছি অশ্বিদ্বয়ের কাছে। সব নিষ্ফল হয়েছে। নাসত্যদ্বয়কে আমার উপর বিরূপ জেনে, স্তুতি করেছিলাম ঋভুগণের। ঋভুগণ নিজেদের বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে আবার যুবা করেছিলেন, তাঁরা মৃত ধেনুর চর্ম থেকে জীবিত ধেনু উৎপাদন করতে পেরেছিলেন, পারেননি শুধু আমার দেহ-ত্বকে পরিবর্তন আনতে। হয়ত প্রতি ক্ষেত্রে আমার যজ্ঞস্তুতিতে কোন ত্রুটি থেকে যাচ্ছে; নইলে তেত্রিশজন দেবতার মধ্যে একজনের মনও কি গলত না। অগ্নি, মিত্র, বরুণ, সকলের পায়ে মাথা কুটেছি। কিন্তু অপালার যজ্ঞ যে কখনও ত্রুটিহীন হতে পারে না। তার সান্নিধ্যে যজ্ঞস্থলীতে স্পর্শদোষ লাগে যে। সে ছুঁলে পিষ্ট সোম অপবিত্র হয়ে যায় যে। দেবতারা তার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেছেন যখন তখন আর তার কী করবার আছে।

আকাশে মেঘ নাই, কিন্তু গরম গুমট ভাবটা ক্রমেই বাড়ছে। ইন্দ্রদেব বোধহয় পত্নীর সঙ্গে এখন সুখশয্যায় সুপ্ত। সেজন্যই বোধহয় আকাশে মেঘ নাই। শচীপতি যখন নিদ্রামগ্ন হন, তাঁর অনুচর মরুৎগণও তখন নিজ নিজ স্থানে বিশ্রাম করেন। সেই জন্যই বোধহয় আবহমণ্ডলের গুমট ভাবটা ক্রমেই বাড়ছে। নদীতীর এখান থেকে বেশী দূরে নয়। সেখানে যেতে পারলে বোধহয় শরীর একটু শীতল হ'ত। তৃষ্ণাও পেয়েছে; কিন্তু এখান থেকে এখন আর

নড়তে ইচ্ছা করছে না। এই গরমে দেহে বস্ত্র রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না। একটা ব্যাঙের ডাক কানে এল। অভ্যাসবশে অপালা হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল। এ ডাক শুনলেই প্রণাম করতে হয়; মণ্ডুকরা পর্জন্যদেবের প্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করে কিনা, সেইজন্য। দূর থেকে ব্যাঙের ডাকটা শুনতে লাগছে বেদমন্ত্রপাঠের ধ্বনির মত।

শরীর বড় বিকল লাগছে তার। জোনাক-পোকা জ্বলছে নিভছে; ঝিল্লী ডেকে চলেছে অবিরাম; শুকনো পাতার উপর দিয়ে কি যেন একটা থরথর করে চলে যাবার শব্দ হল। শৃগাল দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করছে। দূরের কোন এক গাছে একটা চাতক ডেকে ডেকে সারা হ'ল। সঙ্গীকে ডাকছে কিন্তু সাড়া পাচ্ছে না। ভূমিতে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে অপালা, আকাশের দিকে তাকিয়ে। অগণিত তারা আকাশে। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে যে ওগুলো ইন্দ্রের সহস্র চোখ। সহস্র-লোচন সহস্র চক্ষু দিয়ে দেখছেন তাদের দিকে। এক সঙ্গে বহু দিকে তাঁর দৃষ্টি নিয়োজিত। কত কাজ তাঁর। রাক্ষস দের নগরী ধ্বংস করা, দস্যুদের নাশ করা, নদী ও সমুদ্র পূর্ণ করা, মেঘ বিদীর্ণ করে জল বর্ষণ করা, প্রকুপিত পর্বতদের নিয়মিত করা। তিনি অহিকে বিনাশ করেছেন, বৃত্রকে বধ করেছেন, বল নামক অসুরের কাছ থেকে অপহৃত গোযূথ উদ্ধার করেছিলেন। স্তুতিমন্ত্রে গাঁথা আছে বলে এ সব কীর্তিকাহিনী সকলের মুখস্থ। কিন্তু লোকে ভুলে যায়, সাধারণ লোকের উপর তার অসাধারণ কৃপাগুলি। বিবাহেচ্ছু, অন্ধ ও পঙ্গু পুরোবৃহ ঋষিকে ইন্দ্রদেব সোমপানের আনন্দে দৃষ্টিশক্তি ও চলচ্ছক্তি পাইয়ে দিয়েছিলেন। পিতা অত্রির স্বচক্ষে দেখা ঘটনা এটা, মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে অপালার প্রার্থনা নিষ্ফল হয় কেন? সোমপানের আনন্দ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হয়, আর সে যে সমাজের উপর অভিমানে সোমাভিষব-প্রস্তর স্পর্শ করা ছেড়ে দিয়েছে অনেক কাল থেকে। ইন্দ্র যে জন্মাবার পরই মাতৃস্তন্য থেকে সোমপান করেছিলেন। বিনা সোমে তাঁকে আহ্বান করে বলেই বোধহয় তিনি অপালার ডাকে সাড়া দেন না। সে যে এখন এখানে মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তা কি ওই সহস্র চোখের একটা চোখেও মুহূর্তের জন্য দৈবাৎ পড়তে পারে? ভাবতেও গায়ে

শিহর লাগে। কিন্তু দেবতার দৃষ্টি পড়বার মত মানবী অপালা নয়। নিষ্পলক চাউনি তারাগুলির—নিরাসক্ত—ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। সোমপা ইন্দ্রের কি এখন মানুষের দিকে ফিরে তাকাবার সময় আছে। সময় যখন পান তখনও বোধহয় তাঁর সহস্র চোখ পঞ্চ-জনপদের সর্বত্র সোমপূর্ণ কলসের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে। কে জানে।

শুয়ে শুয়ে কত কী যে অসংলগ্ন কথা মনে আসছে তার ঠিক নাই। নিজের দুঃসহ জীবনের কথা, পতিগৃহের কয়েক দিবসের স্মৃতি, পিতা অত্রির ইন্দ্রলুপ্তের কথা, সুরভি গাইটির কথা—এসব বিচ্ছিন্ন চিন্তার কি কূলকিনারা আছে। আজ পিতা অত্রির সারারাত্রি নিশ্চয়ই যজ্ঞবাড়ীতেই কাটবে; সুতরাং অপালা নিশ্চিন্ত। বাড়ী ফেরবার তাগাদা নাই তার এখন। চোখের পাতা কখন ভারী হয়ে এসেছে বুঝতেও পারেনি।

যখন ঘুম ভাঙল তখন ভোর হয়েছে। একটা শ্যেনপক্ষী মাথার উপর আকাশে বৃত্তাকারে উড়ছে। অরুণালোকের সঙ্গে নগ্নতার লজ্জার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কাপড়-খান এমনভাবে ছিঁড়েছে যে তা দিয়ে লজ্জা-নিবারণ করা দুঃসাধ্য। তবে ঘুম ভাঙতেই শ্যেনপক্ষী দেখেছে, দিনটা আজ তার যাবে ভাল। নদীতে একটা ডুব দিয়েই সে বাড়ী ফিরবে। ছিন্ন বস্ত্রের জন্যই আরও তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরবার ইচ্ছা। পিতাও নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। রাত্রির নিদ্রার পর মন শান্ত হয়েছে। মনে পড়েছে যে কাল থেকে আহার হয়নি। কাল রাত্রিতে পথ চলবার সময় কাঁটা আর পাথরে ভয় করবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। আজ চলছে ভাল করে পথ দেখে দেখে।

নদী থেকে ফেরবার পথে হঠাৎ নজরে পড়ল! একী! ইন্দ্রজাল নাকী?

চোখ রগড়ে নিল সে। ঠিক সেই রকম জোড়া জোড়া পাতা! এ পাতা চিনতে কি কারও ভুল হবার জো আছে! এ যে সোমলতা। পথের ঠিক মধ্যখানে পড়ে রয়েছে! সোমলতা এখানে এল কি করে? তবে কি পরশু প্রত্যূষে যজ্ঞবাড়ির লোকেরা সোমলতা ধোয়ার জন্য যখন নদীতীরে আসছিল, তখন পথে পড়ে গিয়েছে? কিন্তু এ পাতাগুলো তো বেশ তাজা দেখাচ্ছে! এ যে না চাইতেই পাওয়া! উচ্চ পর্বত থেকে কত পরিশ্রম করে খুঁজে খুঁজে সোমলতা সংগ্রহ করতে হয়। আজ তার দিনটা সত্যই ভাল। শিশুকাল

থেকে কণ্ঠস্থ সোমলতার স্তুতির একটা ঋক গুন গুন করে গেয়ে উঠল সে—
"যাহা নগ্ন তাহা তিনি আচ্ছাদিত করেন, যাহা রুগ্ন তাহা তিনি আরোগ্য করেন, অন্ধ হইয়াও দর্শন করেন, পঙ্গু হইয়াও গমন করেন।"

পথ থেকে তুলে নিয়ে সোমের পাতা কয়টা মুখে পুরল। সোমপাতা চিবুলে শ্রান্তি দূর হয়, ক্ষুৎ-পিপাসা কমে।

লোকমুখে চিরকাল শুনে আসছে যে মুজবান পর্বত থেকে শ্যেনপক্ষী চঞ্চুতে করে প্রথম সোমলতা এনেছিল আর্য মানবদের জন্য। যদি আজকের এই সোমপাতাগুলোও খানিক আগে দেখা শ্যেনপক্ষীটি মুখে করে এনে থাকে মুজবান পর্বত থেকে! যদি অপালার জন্য এনে থাকে! পুলকে দেহ শিউরে ওঠে একথা ভেবে। দূর! তাও কি হয়! কিন্তু যদি সোম-দেবতার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে এর মধ্যে! এক অজানা ভয়ে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। অন্যমনস্ক হয়ে সে জোরে জোরে চিবুচ্ছে পাতাগুলোকে। চিবুবার সময় দন্তঘর্ষণ-জনিত একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। মুখের চর্বিত পাতা আঠা আঠা হয়ে দাঁতের সঙ্গে লেগে লেগে যাচ্ছে। অপালা আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই শ্যেনপক্ষীটি এখনও কোথাও আছে কিনা দেখবার চেষ্টা করে। না নাইতো! এ কী! আকাশের রঙ এমন হয়ে গেল কেন হঠাৎ? ঝড় উঠবে নাকি? দূর থেকে ঝড় আসবার সময়ের মত একটা শব্দ আসছে। এক খণ্ড মেঘও দিগন্ত থেকে ছুটে আসছে এই দিকে!

গাছের পাতা কাঁপল; শাখা দুলল, নদীর জলের ঢেউ তটভূমির উপর আছড়ে পড়ল; অপালার বস্ত্রাঞ্চল উড়ল; এক ঝাঁক বলাকা হঠাৎ আকাশে তাদের গতিমুখ পরিবর্তিত করল; গুরুভার রথচক্রের ধ্বনির মত চাপা মেঘগর্জন কানে এল; মুখ ঢাকলেন সূর্যদেব; অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। শুকনো পাতার ঝাঁক অপালাকে ঘিরে কানামাছি খেলা আরম্ভ করছে; ঝড়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে সে। বিদ্যুৎ চমকাল; কড় কড় করে বাজ পড়ল কাছেই। একটা উত্তাপের হলকা তার গায়ে এসে যেন সজোরে ধাক্কা দিল। মুহূর্তের জন্য বুকের স্পন্দন থেমে গিয়েছে তার।

কী? কে? কেন?

বজ্র-স্তননে দ্যাবা পৃথিবী তখনও থরথর করে কাঁপছেন। হ্রেষাধ্বনি দিয়ে

উজ্জ্বল বর্ণের এক অধীর অশ্ব থামল এসে সম্মুখে। স্বর্ণময় রথ থেকে নামলেন, কে উনি? শ্মশ্রুল বদন মণ্ডল—বজ্রবাহু—সুঠাম দেহ—পানার্থী ঋষভের মনোরম দ্রুত নর্তিত গতিভঙ্গী! একেবারে অপালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে সোম অভিষুত হচ্ছে?"

অপালা ঘাড় নেড়ে জানাল—"না"।

"সে কী! আমি যে অভিষব-প্রস্তরে সোম নিষ্পীড়িত করবার ধ্বনি শুনতে পেয়েছি। সেই শব্দ শুনেই তো আমি এলাম।"

"গঙ্গুর বাড়ি সোম ছেঁচবার শব্দ শোনেননি তো?"

"না"।

"আপনি, শুনলেন কোথা থেকে?"

"শুনলাম ইন্দ্রপুরী থেকে। সোম-নিস্যন্দী প্রস্তরের আহ্বান এখান থেকেই গিয়েছিল। আমার ভুল হয় না।"

ইন্দ্রপুরী থেকে! দেবরাজ ইন্দ্র। তার সম্মুখে। হাতে বজ্র! হরিবাহন ইন্দ্র। এই অশ্বই হরি!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অপালা। এতকাল যে দেবতার কত স্তবস্তুতি করেছে তাঁকে সম্মুখে দেখে প্রণাম করতেও ভুলে গেল।

দেবতাদের তো ভুল হয় না। সে সোমপাতা চিবুচ্ছিল ঠিকই। তার দন্ত-ঘর্ষণজাত শব্দটাই তাহলে ইন্দ্রের কানে গিয়েছে।

"অপালা, সোমপানের জন্যই আমি এসেছি"।

ইন্দ্রের চোখে দুষ্টামির হাসি।

এরকম সঙ্কটের জন্য অপালা তৈরী ছিল না, কোন মানুষ তৈরী থাকতে পারেনা। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে সে। দেবতাদের সঙ্গে কেমনভাবে কথা বলতে হয় জানা নাই! কী বলবে সে?

অতি কষ্টে অস্ফুট স্বরে বলে—"তাহ'লে আপনি গঙ্গুর বাড়ীতে যান। সেখানে পবিত্র গোচর্মের উপর স্থিত কলসে, মদকর সোমরস রাখা আছে। সেখানে দুধ মেশানো সোমও আছে, আবার দই আর ছাতু মেশানো সোমও আছে। যা আপনার ইচ্ছা, পেতে পারেন।"

"না, সেখানে আমি যাবনা।"

"কত স্তুতি দিয়ে আপনার পরিচর্যা করবে সেখানে গঙ্গু আর তার স্ত্রী।

"আমি তোমার মুখের সোমই পান করব।"

মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে অপালার। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

"এ কি কথা বলছেন, শচীপতি! উচ্ছিষ্ট সোম? আমার মুখের লালাসিক্ত সোম? পান করবেন? আপনি? আমাকে অপরাধী করবেন না একথা বলে! আপনার যে পান করবার নিয়ম, অপর বত্রিশজন দেবতাদেরও আগে। আপনার যে পান করবার রীতি, হোতার হাত থেকে স্বাহাকারে অগ্নিতে প্রদত্ত সোম, কিংবা বষটকার দ্বারা প্রক্ষিপ্ত সোম। মরুৎগণের সঙ্গে মিলে অগ্নির জিহ্বা দিয়ে সোমপান করাই যে আপনার অভ্যাস!"

ইন্দ্র অবিচল।

"আমি তোমার মুখ থেকেই সোমপান করব।"

"আপনার যে পান করবার বিধি চমূ এবং চমস নামক পাত্র থেকে। আমার মুখ থেকে খেতে যাবেন কেন? অভিষব পাথরে এ সোম বাটা হয়নি, মেয়েরা দশ আঙুল দিয়ে এ সোমকে চটকায়নি, মেষলোমের পবিত্র ছাঁকন দিয়ে এ সোম ছাঁকা হয়নি; মুঞ্জ-তৃণ দিয়ে এ সোম শোধিত হয়নি, গোচর্মের উপর একে রাখা হয়নি। এ সোম পান করা কি আপনার সাজে? গঙ্গুর বাড়ীর সোম সূর্যকিরণ-সেবিত ও মদকর; আমার মুখের সোমের মত সদ্য-নিষ্পীড়িত নয়। সোম-রসের সঙ্গে ক্ষীর দই না মিশালে কি আপনার যোগ্য পানীয় তৈরী হয়! গঙ্গুর বাড়ীর সোম পান করে আপনি নিশ্চয়ই তৃপ্ত হবেন।

"তোমার মুখ থেকেই আমি পান করব।"

ইন্দ্রের চোখে প্রত্যাশিত ঔদাসীন্য নাই। এতক্ষণে অপালার মনে পড়ল নিজের গায়ের কাপড় টেনে দেবার কথা। শতছিন্ন হলেও কাপড় তো। সে জানে সোমপানেচ্ছু ইন্দ্র কোনদিন কোন বাঁধা মানেননি। এখন তাঁকে আটকাবে কে? অপালা তো সামান্য মানবী। বজ্রের মত কঠোর ইন্দ্র। ইনি নিজের মাতাকে বিধবা করতেও দ্বিধা করেননি। নিজের উদ্দেশ্য ব্যাহত হলে তিনি নির্দয়। এঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করা বৃথা। এখান থেকে

পালাবার চেষ্টা করাও সম্ভব নয় এখন। কী করতে পারে সে অবলা নারী। তবু বলে—"আপনি পরিহাস করছেন আমার সঙ্গে ?"

"পরিহাস কৌতুকের কোন কথা নাই এর মধ্যে। আমি তৃষার্ত।"

তৃষার্ত ইন্দ্রের আর অপেক্ষা করবার ধৈর্য নাই। হরিও অধীরতা জানাচ্ছে, খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ে। অপালা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে। পায়ের দিকটা তার দুর্বল লাগছে। জঘন কাঁপছে থরথর করে। কড়কড় করে মেঘ ডাকল। হুহু শব্দে পবন বইল। মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। ইন্দ্রাশ্ব হরির দেহ থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে ; সে অন্য দিকে তাকিয়ে। সোমরসের প্রবাহ সংযত রাখবার কথা অপালার খেয়াল আছে এখনও।

বর্ষণ থেমেছে। হরি হ্রেষাধ্বনি দিচ্ছে, যাবার সময় হল। তৃপ্ত দেবরাজের কাছে অপালা তিনটি বর চইল।

"আমার পিতার মস্তক কেশপূর্ণ হউক !"

"তথাস্তু।"

"আমার পিতার অনুর্বর শস্যক্ষেত্র উর্বরা হউক !"

"তথাস্তু।"

"দেহত্বকের রোগের জন্য আমি পতি-পরিত্যক্তা।"

অপালার গায়ের চামড়া ইন্দ্র, একবার নয়, দুইবার নয়, তিন তিনবার সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ফেললেন—ফলের খোসা ছাড়াবার মতন করে নির্দয়ভাবে।

অপালার দেহত্বকের অসম্পূর্ণতা ঘুচল। রথে চড়বার সময়ের ইন্দ্রের মুখের স্মিত হাসিটুকু তার দৃষ্টি এড়াল না। পরম পরিতৃপ্তির হাসি।

নির্জন নদী পথে অপালা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। মেঘ কেটেছে। গাছের পাতা থেকে মুক্তা ঝরছে ইন্দ্রধনুর রঙের, অপালার গায়ের রং হয়েছে সোনার মত। সারা গায়ে তার সোনার গহনা—মাথায় শিপ্র, বুকে রুক্ম, গলায় নিষ্ক, দুই হাতে সুবর্ণ—খাদি। দানে ইন্দ্র অকৃপণ।

মর্ত্যের মদকর স্বাদ নিয়ে ইন্দ্র পরম পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গিয়েছেন ; কিন্তু অপালা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেইখানটায়। একটা গভীর অতৃপ্তিতে তার মন ভারাক্রান্ত—এত সৌভাগ্যের মধ্যেও। লোকালয়ের দিক থেকে একটা কোলাহল ক্রমেই এগিয়ে আসছে। অত্রি বোধ হয়

দলবল নিয়ে মেয়ের খোঁজে বেরিয়েছেন। স্বর্গের পরশ পাওয়া মর্ত্যটুকুও অপালার কাছে স্বর্গই। বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত সে সেই জায়গাটা থেকে নড়তে চায় না। এর পরই তো সকলের প্রশ্নবাণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হবে। মর্ত্যে নকল স্বর্গ গড়বার জন্য যা কিছু দরকার সব সে পেয়েছে, কিন্তু আসল স্বর্গের স্বাদ যে এখনও তার মুখে লেগে। এই স্বাদটুকু সে যতক্ষণ পারে ধরে রাখতে চায় অতি সঙ্গোপনে। অন্য কিছু মুখে দিয়ে এ স্বাদকে নষ্ট হতে দিতে চায় না। তাই সে ঠিক করে ফেলেছে যে পিতা অত্রি তাকে আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করলে, সে বলবে যে তার উপবাস আজ।

কে বললে যে প্রত্যূষে সোমপাতা খেয়ে ইন্দ্রস্তুতির উপবাস হয় না? ভুল কথা। এই হবে ব্রহ্মবাদিনী অপালার জীবনের প্রথম এবং শেষ মিথ্যাচার —মানুষের কাছে এবং ইন্দ্রানীর কাছেও।

॥ চরণদাস এম, এল, এ ॥

মা-বাপের কাছ থেকে পাওয়া নাম চরণ দাস। একসময় লোকে ভালবেসে ডাকত চরণদাসজী বলে। পরিস্থিতি বদলেছে। আজকাল সরকারী দপ্তরে তাঁর নাম শ্রীচরণ দাস, এম-এল-এ। সাধারণ লোকের মধ্যে যারা নিজেদের ইংরাজী জানা ভাবে, তারা আজকাল ডাকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব বলে; আর যাদের ইংরাজী জানবার কোনরকম দাবি নাই তারা ডাকে মায়লে-জী বলে। এই উচ্চারণ-বিকৃতি কোন রকম দুরভিসন্ধিজাত নয়।

সেই মায়লেজী এসেছেন তাঁর পুরনো অফিসে। পার্টি অফিস। তাঁর সেকালকার কর্মকেন্দ্র। বছর চারেক পরে এই এলেন স্টেশন থেকে, রিকশাতে করে।

ফ্যাসাদ! লটারির টিকিট না কিনলে লটারিতে টাকা পাবার উপায় নাই; ভোটে না দাঁড়ালে এম-এল-এ হবার উপায় নাই!

আর এম-এল-এ না হতে পারলে? সে কথা বলে কাজ কী!

যখন পৌছলেন তখন সবে ভোর হয়েছে।

"নমস্তে লখনলালজী!"

"আরে! ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব যে! নমস্তে!"

"সব ভালতো?"

"হাঁ। আপনার কুশল বলুন! একেবারে কোন খবর না দিয়ে যে?"

"এই এলাম আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে।"

"তা বেশ করেছেন। আসাই তো উচিত। 'হায়-কমাণ্ড' হুড়ো দিয়েছে বুঝি?"

এম-এল-এ সাহেব এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। লখনলাল ধরেছে ঠিকই। 'হাইকম্যাণ্ড' নামের এক খামখেয়ালী, সর্বপ্রতাপশালী ভগবানকে তিনি

ভয় করেন। সেই 'হাইকম্যাণ্ড' নাকি বলেছেন যে আসল ভগবান হচ্ছেন ভোটার। নারায়ণের চেয়েও বড়, নরনারায়ণ। ভোটারদের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক কম তাঁকে নাকি আসছে বার আর এম-এল-এ করা হবে না। শুনেই ছুটে এসেছেন তিনি নকল ভগবান ছেড়ে আসল ভগবানের শরণে। লখনলাল একসময় ছিল তাঁর শাগরেদ; এখন প্রতি মাসে তাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশটা করে টাকা নেয়, এবং প্রতিদিন তাঁর ইয়েমিয়েলিয়েগিরি ঘোচাবার হুমকি দেখায়। তাঁর অপরাধ তিনি দশ-বারো বছর থেকে সপরিবারে রাজধানীতে থাকেন; এখানে আসেন কম। এখানকার যেসব কর্মীদের তিনি এক সময় নিজ হাতে গড়েপিটে মানুষ করে তুলেছিলেন, তাদের সবগুলোর আজ পাখা গজিয়েছে। সবগুলোর ওই একই ধুয়ো—তিনি নাকি এম-এল-এ হবার পর থেকে এখানকার ভোটারদেব সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না। এরা সবাই মাসে বিশ দিন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে রাজধানীতে 'এম-এল-এ কোয়ার্টার্স'এ তাঁর অন্ন ধ্বংস করে, হাইকোর্টে নিজেদের মোকদ্দমার তদ্বির করে, আর সরকারী দপ্তর থেকে নানারকম অন্যায় সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য তাঁকে জ্বালিয়ে মারে। এর পরিবর্তে পান থেকে চুন খসলে শাসানি তাঁর প্রাপ্য। তাদের মন জুগিয়ে চলতে হয় তাঁকে অষ্টপ্রহর। ঘেন্না ধরে গেল একেবারে! কিন্তু উপায় কি!

এরই নাম পরিস্থিতি। তাঁদের অভিধানের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত শব্দ। মত বদলাবার অজুহাত হিসাবে কাজে লাগে কিনা কথাটা।

ঝোলা আর কম্বলটা রিকশা থেকে নামিয়ে, রিক্শাওয়ালাকে আট আনা পয়সা দিতেই সে 'জয় গুরু' বলে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। লখনলালজী হাসছেন।

"আর চার আনা পয়সা দিয়ে দেন ওকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব। আজকাল বারোআনা করে রেট হয়ে গিয়েছে। আপনি সেই চার বছর আগেকার রেটই জানেন কিনা।"

অপ্রস্তুত হয়ে এম-এল-এ সাহেব আর চার আনা পয়সা বার করে দিলেন। পয়সা নিয়ে রিকশাওয়ালা 'জয় গুরু' বলে চলে গেল।

লখনলাল তাঁর ঝোলা আর কম্বল তুলে নিয়ে ঘরে রাখতে যাচ্ছিল।

"আহা করেন কী লখনলালজী! ভারী তো জিনিস।"

এম-এল-এ সাহেব তার হাত থেকে নিজের জিনিসগুলো কেড়ে নিয়ে, ঘরের মধ্যে রাখলেন।

"জন-সম্পর্ক বাড়াবার প্রোগ্রামে আসবার সময় হোল্ড-অল্ আর স্যুটকেস না এনে ঠিকই করেছেন ইয়েমিয়েলিয়ে-সাহাব।"

তার চোখে দুষ্টুমির হাসি। সে বোঝে সব। সাধে কি আর তাকে মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা দিতে হয়।

"যে কাজে এসেছি সে কাজের দিক দিয়ে দেখতে গেলে লোকজনের সম্মুখে আমাকে বারবার এম-এল-এ-সাহেব বলে না ডাকাই ভাল, তাই না? আপনাদের কাছে তো আমি সেই পুরনো চরণ দাসই আছি এখনও।"

"শুধু চরণ দাস নয়। আপনি এখন এসেছেন ভোটারদের চরণে আশ্রয় নেবার জন্য। আপনার নাম এখন হওয়া উচিত ভোটার-চরণ-দাস। বোলো একবার ভোটার-চরণ দাসজীকী জয়!"

চীৎকারে আর উচ্চহাসিতে ঘরের সকলের ঘুম ভাঙ্গল। কে একজন যেন 'জয় গুরু' বলে চোখের পাতা খুলল। পাশের বালিশের লোকটি তার মুখ চেপে ধরেছে—"আমাদের সেক্যুলার সংবিধান"—এই কথা বলে হাসতে হাসতে।

বচ্‌কন্ মহতো লাফিয়ে উঠেছে খাটিয়া ছেড়ে।

"আরে মায়লেজী যে! নমস্তে! কখন? কবে? কোথায় উঠেছেন? সার্কিট হাউসে না ডাকবাংলায়?"

চরণ দাস ঠিক করে রেখেছেন যে এখানে কারও কথায় বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। এদের বলার উদ্দেশ্য যে তিনি এখানে কখনও এসে ওঠেন নি গত কয়েক বছরের মধ্যে। দুইবার মন্ত্রীদের সঙ্গে এসেছিলেন দুই দিনের জন্য; তখন উঠেছিলেন সার্কিট হাউস-এ। সেই খোঁটাই বোধহয় এরা দিচ্ছে এখন।

বললে, "এখানেই এসে উঠলাম।"

"কেন? বাড়ী ভাড়া আদায় করতে নাকি?"

খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে জানে না এরা। তাঁর এখানকার পৈতৃক বসতবাড়ীটা তিনি গভর্ণমেণ্টকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন বছর কয়েক হল। এখানকার লোকে ভাল চোখে দেখেনি জিনিসটাকে। কোন জিনিস তলিয়ে দেখে না এরা। রাজধানীতে পরিবার নিয়ে থাকেন; ছেলেমেয়েরা সেখানকার স্কুল-কলেজে ভরতি হয়েছে। যা আয় তাতে দুই জায়গায় বাড়ির খরচ চালানো শক্ত, সেইজন্য এখানকার বাড়ী গভর্ণমেণ্টকে ভাড়া দিয়ে দিতে হয়েছে। এই সামান্য কথাটা বুঝবে না এরা।

"না, এমনি আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে এলাম।"

"ক' দিনের প্রোগ্রাম মায়লেজীর?"

"দেখি তো।"

"এক আধদিনের বেশী কি আর থাকতে পারবেন এখানে!"

"কি যে বলেন!"

ব্যথা পান এম-এল-এ সাহেব। এরা ভাবে তিনি ইচ্ছা করে এখানে আসেন না। ভুল ধারণা। ইচ্ছা থাকে, কিন্তু হয়ে ওঠে না। কতবার ঠিক করেছেন আসবেন; কিন্তু একটা না একটা বাধা এসে পড়ায় হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া অন্য কথাও আছে এর মধ্যে। বারো বছর বড় শহরে থাকবার পর ছেলেমেয়েরা আর এখানে ফিরে আসতে চায় না। ছোটছেলেটার জন্ম রাজধানীতে; এখানকার শিয়ালের ডাকে রাত্রিতে ভয় করবে, এই হচ্ছে তার মায়ের ধারণা। স্ত্রীর পুরনো অম্বলের ব্যাধিটাও রাজধানীতে গিয়ে সেরেছে। এইসব নানা কারণ মিলিয়ে এখানে আসা হয়ে ওঠে না। সবচেয়ে তাঁর আশ্চর্য লাগে যে সেখানকার শহুরে সমাজের বন্ধুবান্ধবরা আজও তাঁকে পাড়াগেঁয়ে ভাবে, আর এখানকার লোকে অপবাদ দেয় যে তিনি আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণ শহুরে হয়ে গিয়েছেন; তাঁর দশ বছরের মেয়েটার পর্যন্ত রাজধানীতে জন্মাবার অধিকারে, বান্ধবীদের সম্মুখে বাবার গ্রাম্য আচরণে, লজ্জা লজ্জা করে।

"আচ্ছা, পরে সব কথা হবে; এখন মুখ হাত ধুয়ে নিন, মায়লেজী। দাঁতন তো আপনার দরকার নাই?"

প্রশ্নের উত্তর দিল লখনলাল—'হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁতনের দরকার বইকি।

উনি দাঁত মাজবার বুরুশ আনলেও এখানে ব্যবহার করবেন না। এ যাত্রায় উনি একেবারে পুরনো চরণদাসজী সেজেছেন। নিছক ভোটার-চরণ-দাসজী।

বাগে পেলে, রেখে ঢেকে কথা বলতে এরা জানে না। বাধ্য হয়ে এ রসিকতায় এম-এল-এ সাহেবকেও হাসতে হয় এদের সঙ্গে সঙ্গে।

"আচ্ছা আমি আসছি একটু এদিক ওদিক ঘুরে।"

দাঁতন নিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে তিনি বার হলেন অফিস থেকে।

বচ্‌কন্‌ মহতো রসিকতা করে—"আরম্ভ হয়ে গেল মায়লেজীর জনসম্পর্ক স্থাপনার প্রোগ্রাম।"

লখনলালজী ফোড়ন দেয়—"সে তো আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বোলো একবার ভোটার-চরণ-দাসজী কী জয়।"

ভোরবেলায় দাঁতন করতে করতে এম-এল-এ সাহেব পাড়ার লোকজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ সহজভাবে মেলামেশা করে নিতে চান। ইচ্ছা করলেও কি এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলা যায়! নাড়ীর টান যে। গায়ের ময়লা নয় যে ইচ্ছা হলেই ডলে ফেলে দেবে!

ও কে আসছে—স্থন্‌রা না? খুব হন হন করে চলছে সে।

"নমস্তে স্থন্দরলালজী।"

"জয়গুরু! আরে আপনি। আমি চিনতেই পারিনি।"

"খবর সব ভাল ত?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা চলি। জয় গুরু।"

তেমনি হন হন করেই স্থন্‌রা চলে গেল। ব্যস্ত এবং একটু অন্যমনস্ক ভাব তার। এম-এল-এ সাহেব ভেবেছিলেন যে তার কাছ থেকে কথায় কথায় জেনে নেবেন পাড়ায় এখন কে অস্থস্থ আছে। তার পর কিছু ভাল পথ্য কিনে নিয়ে অন্য সময় রুগীর বাড়ীতে যাবেন। কিন্তু কথা বলবার স্থযোগ পাওয়া গেল না স্থনরার সঙ্গে, একটু ক্ষুণ্ণ হলেন তিনি। ঠিক এরকমটা আশা করেন নি। লখনলালের দল রাজধানীতে তাঁর কাছে প্রায়ই বলত যে এখানকার পরিস্থিতি বদলেছে; রাজনীতিক মিটিং-এ লোকজন হয় না; লীডাররা গেলে তাঁদের মালার জন্য গৃহস্থবাড়ী থেকে গাঁদা ফুল পাওয়া পর্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি এসব কথা বিশ্বাস করতেন না; ভাবতেন লখনলালরা

বোধহয় তাঁকে মোচড় দিয়ে আরও কিছু বেশী টাকা আদায় করতে চায়। সুন্‌রার এখনকার হাবভাবে মনে হ'ল যে কথাটার মধ্যে কিছু সত্য থাকতেও পারে।

একটি ছোট ছেলে ছুটছে। মনে মনে ঠিক করা ছিল যে ছোট ছেলে দেখলেই গাল টিপে আদর করবেন; আর তার চেয়ে ছোট হলে কোলে নিয়ে লজেনস্‌ খেতে দেবেন। পকেট ভরতি করে তিনি লজেনস্‌ টফি নিয়েছেন। হেসে ছেলেটাকে ডাকলেন। সে ফিরেও তাকাল না। ছুটে চলেছে রাস্তা ধরে। একটু হতাশ হলেন।

বারো বছরের অনভ্যাসে, পথের ধুলো-কাঁকরের উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে। কাঁটার ভয়ে, ভাঙ্গা কাচের টুকরোর ভয়ে, একটু সাবধান হয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছেন। আগেকার জীবনের খালি পায়ে চলাফেরার সেই সাবলীলতা আর ফিরে আসবার নয়। 'হুক্‌-ওঅর্ম'-এর ভয় সেকালে কখনও হয়নি। নিজের অজ্ঞাতে কখন থেকে যেন নাকে কাপড় দিয়ে চলছিলেন। লোটা হাতে একজনকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে নিলেন। বিরসা আসছে এগিয়ে। তাঁকে চেনবার চেষ্টা করল; অন্তত চাউনি দেখে তাই মনে হয়। বিড়বিড় করে কি একটা স্তোত্র বলছে সে।

"নমস্তে বৃহস্পতিজী!"

"জয় গুরু! মায়লেজী? আমি চিনতেই পারছিলাম না। খালি গায়ে খালি পায়ে আপনাকে দেখব ভাবিনি কি না।"

"খবর ভাল ত সব?"

"হ্যাঁ! আচ্ছা এখন আসি। জয় গুরু!"

বিড় বিড় করে স্তোত্রপাঠ করতে করতে সে চলে গেল। অল্পতে মুষড়ে পড়বার লোক তিনি নন। তবু বর্তমান পরিস্থিতির খারাপ দিকটা মনে না এনে পারলেন না। এখানকার লোকে তাঁকে চিরকাল কত ভালবাসত। আগেকার জীবনে সেইটাই ছিল তাঁর পুঁজি। পরের জীবনটুকু ভেবেছিলেন সেই পুঁজি ভাঙ্গিয়েই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তা আর বোধহয় তাঁর কপালে নাই! সন্দেহ হল, লখনলালজীরাই তাঁর বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যা প্রচার করেনি

তো, এখানকার লোকজনের মধ্যে ? কিছু বলা যায় না। তার নিজেরই ইচ্ছা থাকতে পারে এই নির্বাচনক্ষেত্র থেকে এম-এল-এ-র জন্য দাঁড়াবার ! হাই-কম্যাণ্ডের কাছেও চুপি চুপি তাঁর বিরুদ্ধে লাগায় নি তো কিছু ? ভগবান জানেন !

একজন বর্ষীয়সী মহিলা হাতে একটা পাতার ঠোঙ্গায় কি যেন নিয়ে, ধানের ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে চলেছেন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে।

চরণদাসজী চশমাটা খুলে রেখে এসেছেন ; তাই দূরের জিনিস দেখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তিরথার মা বলেই মনে হচ্ছে যেন ওঁকে। হ্যাঁ, ঠিকই তাই।

"ও চাচী ! কোথায় এই সকালে এত তাড়াতাড়ি ?"

বৃদ্ধাটি মাথার কাপড় টেনে দিয়ে আরও তাড়াতাড়ি হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

"ও চাচী ! তীর্থানন্দের খবর ভাল তো ? নাতিপুতিরা সব ভাল তো ? চিনতে পারছেন না ? আমি চরণা।"

কী বুঝলেন, না বুঝলেন তিনিই জানেন। দেখা গেল তাঁর গতি দ্রুততর হয়েছে। পাটের ক্ষেতের পাশ দিয়ে বেরিয়ে ফুলের সাজি হাতে করে একটি মহিলা 'জয় গুরু' বলে তাঁকে অভিবাদন করায় তিনিও 'জয় গুরু' বলে মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালেন। কি যেন কথা হ'ল। দুইজনেই একবার চরণদাসজীর দিকে তাকালেন। তারপর দুই জনেই একই পথে এগিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে সত্যই চিন্তান্বিত হলেন এম-এল-এ সাহেব। জনসম্পর্ক স্থাপনার কাজটা যত সহজ ভেবেছিলেন, তত সহজ নয়।

লাঠিতে ভর দিয়ে চথুরি চলেছে। সে এমনিতেই একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক চিরকাল। একটু ইতস্তত করে তাকে ডাকলেন তিনি। ছেলেবেলায় লোকটা তাঁদের বাড়ির মোষ চরাত। সে দাঁড়াল—একটু অবাক হয়ে।

"জয় গুরু ! ও আপনি ! চিনতে পারিনি। রাজধানীর জল দেখছি খুব ভাল। গুরুদেবের কৃপায় আপনার গায়ে বেশ মাংস লেগেছে। লাগবারই তো কথা। ভোরে উঠে দাঁতন করতে করতে খালি পায়ে বেড়াবার পুরনো অভ্যাস এখনও আপনি রেখেছেন দেখছি। সেও ভাল।"

"আরে চথুরি, মানুষ কি আর বদলায়। যে যেমন ছিল তেমনিই থাকে।"

"এ কী কথা বলছেন আপনি মায়লেজী। মানুষ বদলায় না? কত রত্না-কর ডাকাত বদলে মুনি ঋষি হয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, সেই রকম গুরুর মত গুরুর কৃপা চাই। এ কথা আমার গুরুদেবের মুখে কতদিন শুনেছি। আমাদের গুরুদেব তো মানুষ নন—তিনি দেবতা—ঠাকুর—ভগবান! জয় গুরু!"

লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে সে চলে গেল, তাঁকে আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে। বোঝা গেল যে গল্প করে নষ্ট করবার মত সময় তার হাতে তখন নাই। সে দাঁড়িয়েছিল শুধু একটু জিরিয়ে নেবার জন্য। মানুষ যে বদলায় সে কথা আর এম-এল-এ-সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আর যিনি চথুরির মুখে গুরুমাহাত্ম্যের বুলি ফোটাতে পারেন, তিনি যে মূককে বাচাল ও পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি।

আরও যে কয়জনের সঙ্গে দেখা হ'ল, সকলেরই হাবভাব এই একই ধরনের। সকলেই ব্যস্ত। কেউ তাঁকে বিশেষ আমল দিচ্ছে না। নিজের সুখদুঃখের কথা, দেশের অবস্থার কথা, পৃথিবীর রাজনীতির কথা, রকেট, অ্যাটম্ বোমা, আবহাওয়া, ফসলের অবস্থা—প্রত্যাশিত বিষয়গুলোর উপর কোন কথা কেউ তোলেনি। গালাগাল পর্যন্ত কেউ দিল না। কারও কি কিছু চাইবার নাই?—ছেলের চাকরি, 'বাস' চালাবার অনুমতিপত্র, রাস্তায় মাটি ফেলবার ঠিকা, সরকারী লোন, সিমেণ্ট, বন্দুকের লাইসেন্স, মেয়ের বৃত্তি? 'ইলেকশন'-এর বছরে নির্বাচনপ্রার্থীর কাছ থেকে কিছুই চাইবার নাই? ঠিক করে এসেছিলেন, যে যা চাইবে তাকেই সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য স্থানে একখানা করে সুপারিশের চিঠি দেবেন, আর আশ্বাস দেবেন প্রাণপণে চেষ্টা করবার। কেউ কিছু চায়নি। তবে কি এরা সবাই বুঝে গিয়েছে যে, তাঁর চিঠিতে সরকারী মহলে কোন ফল হয় না! যাঁদের কাছে তিনি চিঠি দেন তাঁদের সকলের কাছে আগে থেকে বলা আছে যে এসব সুপারিশপত্রের উপর কোন গুরুত্ব দেবার দরকার নাই। তাঁর এই চালাকি কি এরা ধরে ফেলেছে? লোকে আজকাল চালাক হয়ে উঠছে। সকলে জেনে গিয়েছে যে সরকারী অফিসাররাও আজকাল আর এম-এল-এ'দের কথায় কোন গুরুত্ব দেয় না। আশকারা পাচ্ছে উপর থেকে! গত কয়বছরের মধ্যে সত্যিই এখানকার

লোকজন যেন একটু বদলেছে! এই পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে, এখানকার জীবনের স্বাভাবিক মন্থর গতি, আগেকার তুলনায় দ্রুততর হয়েছে। কর্মব্যস্ততা বেড়েছে। এইটুকুই আশার কথা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল সম্বন্ধে যারা সন্দিগ্ধ, তাদের সম্মুখে সুবিধামত এই দৃষ্টান্তটা তুলে ধরতে হবে, ভোটের মরসুমের বক্তৃতায়।

নিজের জন্মভূমি ও কর্মক্ষেত্রের লোকজনের কাছ থেকে পাওয়া প্রাথমিক অভ্যর্থনা আশানুরূপ না হওয়ায়, একটু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি অফিসে ফিরে এলেন। নিজের দুশ্চিন্তার কথাটা মুখ ফুটে বলতে বাধে অফিসের কর্মীদের কাছে। না বলতেই বুঝে নিয়েছে, এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লখনলাল আর বচ্‌কন্‌ মহতো।

"ঘাবড়াবার দরকার নাই ইয়েমিয়েলি সাহাব। সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে। জলখাবার খাওয়ার সময় সবাই মিলে বসে কেমনভাবে এগুতে হবে তারই একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলতে হবে। আপনি শুধু বার্কারদের (ওয়ার্কার) উপর বিশ্বাস রাখুন।"

"আর একটা কথা মায়লেজী—আসবে নেমে পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করবেন না। তাহলে আসছে বছর ভূতপূর্ব মায়লে হয়ে যাবেন নির্ঘাত দেখে নেবেন!"

এদের সব কথা মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয়।

সেকালকার মত সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি ছোলাভাজা, চিঁড়াভাজা ও পিঁয়াজের বড়ার জলখাবার খেতে বসলেন। আজ তিনি উদার হস্ত; জলখাবারের খরচটা আজ তাঁরই। আরম্ভ হয়ে গেল, খোশগল্পের মধ্যে দিয়ে কাজের কথা।

ভোটার। ভোটার। ভোটার। কেবল ভোটারদের কথা। কটর্‌ মটর করে ছোলা চিবুবার শব্দ এই গল্পের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলেছে। সাব্যস্ত হয়ে গেল—পাবলিক অবুঝ, জনতা খামখেয়ালী, জনসাধারণ নিমকহারাম। ভোটারদের তালিকায় যাদের নাম আছে তারা শুধু মানুষ; বাকি সকলে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে আছে অন্যায়ভাবে।

স্ত্রী-ভোটারদের লখনলালজী বলে ভোটারী। এই ভোটারীদের নিয়ে

তুমুল মতদ্বৈধ বাধল লখনলাল আর বচ্‌কন্‌ মহতোর মধ্যে। বোঝা গেল, জনসম্পর্ক বাড়াবার কার্যপ্রণালী স্থির করবার পথেও বাধা প্রচুর।

এম-এল-এ-সাহেবের ধৈর্যের পুঁজি তার চেয়েও বেশী। কথার মোড় ঘোরাবার জন্য তিনি বললেন—

"মোষের গলার ঘণ্টার এই আওয়াজটা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।"

বহু বড় বড় আবিষ্কারের সূচনা ঘটেছিল দৈবক্রমে। এখানকার ভোটার ভোটারীদের মনের চাবিকাঠির সন্ধানও পাওয়া গেল এই অবান্তর প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে।

"মোষের গলার ঘণ্টার আওয়াজ? বলছেন কী আপনি! দশ বছর রাজ-ধানীতে থেকে আপনি একেবারে পরদেশী হয়ে গিয়েছেন। এ যে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ ভাল করে শুনুন। বুঝতে পারছেন না?"

"হ্যাঁ, এইবার বুঝতে পারছি। আপনাদের চেঁচামেচির মধ্যে আগে এত ভাল করে শুনতে পাইনি। পুজোটুজো আছে নাকি কোথাও?"

"তা জানেন না?

"এর কথাই তো আপনাকে বলে আসছি তিন বছর থেকে।"

"সকালের আরতি।"

"অষ্টপ্রহর মচ্ছব। সকাল বিকাল নাই এর মধ্যে।"

"প্র্যাকটিশ বেশ জমিয়ে নিয়েছেন স্বামীজী তিন বছরের মধ্যে।"

"যাঁকে দশজনে ভক্তি করে, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করা ঠিক নয়।"

"ঠাট্টা করছি কই? যাঁর গা দিয়ে ভক্তরা জ্যোতি বার হতে দেখে, তাঁকে নিয়ে আমি ঠাট্টা করতে পারি?"

তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমাধিস্থ থাকেন, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে।"

"আর উপরের গবাক্ষ দিয়ে ধোঁয়া বার হয়।"

"গোলমেলে ধোঁয়া নয়। নির্দোষ ধোঁয়া। অম্বুরী তামাকের গন্ধওয়ালা ধোঁয়া।"

"ভক্তরা সেই ধোঁয়া নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেবার জন্য বাইরে কাতারে কাতারে বসে থাকে।"

"সুগন্ধি রেচক ও কুম্ভক। যোগ-সাধনার সৌরভ।"

সহকর্মীদের মধ্যে এই সব কথা-কাটাকাটি চলে অনেকক্ষণ। এম-এল-এ সাহেব একটাও কথা বলেননি এর মধ্যে। শুধু শুনছেন ও পরিস্থিতি বোঝবার চেষ্টা করছেন।

সব শুনে মনে হল, এতদিন সহকর্মীরা এখানকার সম্বন্ধে যে সব খবর দিয়েছিল, সেগুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। জগদগুরু শ্রীসহস্রানন্দ স্বামী বছর তিনেক থেকে এখানে আশ্রম খুলে বসেছেন। তিনি সিদ্ধ-পুরুষ এবং এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। এই জন্যই সকলে উঠতে বসতে 'জয় গুরু' বলে, এই জন্যই রাজনৈতিক দলের নেতারা এখানে এসে ফুলের মালা পান না, এই জন্যই খানিক আগে সকলে তাঁর আশ্রমের দিকে ছুটছিল। জিলাপীর লোভে ছুটছিল ছেলেপিলেরা, গুরুদেবের দর্শন পাবার লোভে ছুটছিল বয়স্করা। আশ্রমে দুপুরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ হয় আর সন্ধ্যাবেলায় হয় কীর্তন। স্বামীজী নিজের সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন। তিনি ফল-মূল ছাড়া আর কিছু খান না, এবং টাকা-পয়সা স্পর্শ করেন না। তাঁর নামে সবাই পাগল এবং তাঁর জন্য প্রাণ দিতে পারে না এমন লোক এখানে নাই। তিনি ছুঁলে রোগ সেরে যায়। তাঁর বাকসিদ্ধির খ্যাতি অন্য জেলাতেও নাকি পৌঁছেছে। এ ছাড়া সিদ্ধ-পুরুষের অন্যান্য বিভূতিও তাঁর আছে।

এই সব জ্ঞাতব্য তথ্য একত্র করবার পর চরণদাসজী বসলেন সহকর্মীদের সঙ্গে ভোটারদের স্বপক্ষে টানবার কৌশল ঠিক করবার জন্য। হঠাৎ জমাট আলোচনায় বাধা পড়ল।

"আসুন মৌলবী-সাহেব।"

"আদাব! আদাব ভাইসাহেব!"

এখানে এই প্রথম লোকের সঙ্গে দেখা হল, যিনি 'জয়গুরু' বললেন না। একটু আশ্বস্ত হলেন চরণ দাসজী।

বেশ ভারিক্কে গোছের দাড়ি-সম্বলিত, ভারিক্কে প্রকৃতির লোক মৌলবী-সাহেব। চাকরি করেন। এখানে বদলি হয়ে এসেছেন কিছুদিন আগে। থাকেন মৌলবীটোলা নামক পাড়ায়। এখন তিনি এখানে এসেছেন, সামান্য একটু কষ্ট দেবার জন্য পার্টি অফিসের লোকজনদের।

মৌলবীসাহেবের হাবভাব কথাবার্তা বেশ কেতাদুরস্ত। অতি বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে পার্টি অফিসের লোকজনের সময়ের মূল্য তিনি জানেন। সেই বহুমূল্য সময় নষ্টের হেতু হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন তিনি সরকারী চাকরির কল্যাণে। তিনি এসেছেন সরকারী লোক-গণনার কাজে।

"না না, চিড়ে ভাজা আনবার দরকার নাই। আপনারা খান। সকালে নাস্তা করে তবে আমি বেরিয়েছি বাসা থেকে।"

এখানকার অফিসের স্থায়ী লোকজনের নাম ধাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। বেশ গুছিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে প্রত্যেক ব্যক্তির খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে ছাপা 'ফর্ম' গুলো ভরলেন। কাজের শৃঙ্খলা আছে তাঁর।

তারপর এম এল এ সাহেবকে অতি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"হুজুরের নামও কি এখান থেকেই লেখা হবে?"

অতি নির্দোষ প্রশ্ন, কিন্তু চরণদাস এম এল এ-র মনের এক অতি স্পর্শাতুর জায়গায় আঘাত লাগে। সহকর্মীদের সহস্র বিদ্রূপ তিনি সহ্য করতে রাজী আছেন, কিন্তু সরকারী কর্মচারীর ধৃষ্টতা বরদাস্ত করবার পাত্র তিনি নন।

"এখানে লেখা হবে না তো, আবার কোথা থেকে লেখা হবে!"

"আপনি এখন আর এখানে থাকেন না তো; সেইজন্য জিজ্ঞাসা করলাম হুজুরের কাছে!"

"আমার ঘর-বাড়ি সব এখানে। আমি এখানকার বাসিন্দা নই?"

"আপনার বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন কিনা; তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম কথাটা।"

"বসতবাড়ি ভাড়া দিয়েছি বলে ভোটারতালিকায় নাম থাকবে না আমার?"

"গোস্তাকি মাপ করিবেন হুজুর; ভোটার-তালিকার সঙ্গে আদম-শুমারির কোন সম্বন্ধ নাই।"

"আচ্ছা, যথেষ্ট হয়েছে! আইনচঞ্চুমশাই, এবার থামুন আপনি! সরকারী নিয়ম-কানুন আর শেখাতে হবে না আমাকে, আপনার!"

"তোবা! তোবা! হুজুরকে কানুন শেখাব আমি? আমরা হুকুমের চাকর মাত্র; আপনারাই তো কানুন তৈরী করেন। আপনি যদি এখানকার আদম-

গুমরের মধ্যে নাম দিতে চান, তবে তাই হবে। যেখানে ইচ্ছা আপনি নাম দিতে পারেন।"

এম-এল-এ সাহেবের মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ জাগে। মৌলবীসাহেবটি তাঁর রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর দলের লোক নয়তো ?

"তবে এতক্ষণ এত আইন-কানুন ঝাড়ছিলেন কেন! তিন পয়সা মাইনের চাকরি, আর লম্বা লম্বা কথা।"

"আপনি গণ্যমান্য ব্যক্তি। ভদ্রলোকের ভাষায় কথা বলা উচিত আপনার।"

"মুখ সামলে কথা বল বলছি ! আমাকে অভদ্র বলা ! এখানকার সেন্সাস অফিসার কে ? তোমার চাকরি আমি খাব—এই বলে রাখলাম ! সরকারী মহলে সে প্রতিপত্তিটুকু আমি রাখি, বুঝলে !"

"সব বুঝেছি ; আর বোঝাতে হবে না। এখন বলুন আপনার নাম !"

কলম হাতে নিয়ে 'ফর্ম' সম্মুখে রেখে, উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন মৌলবী-সাহেব। এম-এল-এ সাহেব নিরুত্তর, লোকটির ধৃষ্টতা দেখে। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করছে—যেন জানে না।

"জীবিকা ?"

এম এল এ নিরুত্তর।

"বিবাহিত না অবিবাহিত ?"

উত্তর দিলেন না চরণদাসজী।

"বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নাকি ? বৈজ্ঞানিকদের আলাদা কার্ড আছে।"

আর থাকতে পারলেন না চরণদাস এম-এল-এ।

"বেয়াদব লোকদের বৈজ্ঞানিকভাবে মেরে শায়েস্তা করতে আমি বিশেষজ্ঞ।"

আস্তিন গুটিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দলের লোকেরা তাঁকে ধরে ফেলল।

মৌলবীসাহেব ধীর কণ্ঠে উপস্থিত অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—

"ইনি আমার লোকগণনার কাজ অসম্ভব করে তুলেছেন ; অপমান করেছেন ; মারধরের হুমকি দেখিয়েছেন ; চাকরী খাওয়ার ভয় দেখিয়েছেন। শুধু নাম-ধাম বলতেই অস্বীকার করেননি—একজন সরকারী কর্মচারীকে তাঁর আইনসঙ্গত সরকারী কাজে বাধা দিয়েছেন। আপনারা সবাই সাক্ষী। আমি আজই এঁর বিরুদ্ধে কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করব।"

"নালিশ দায়ের করবার হুমকি দেখায়! জনসাধারণের প্রতিনিধিকে! ছাড় তোমরা, ওকে ঘাড় ধরে বার করে দিচ্ছি এখনই!"

তাঁর আস্ফালনে কান না দিয়ে সহকর্মীরা এম-এল-এ সাহেবকে জাপটে ধরে রেখেছে।

মৌলবীসাহেব ধীরেসুস্থে নিজের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে, গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। চোখমুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ব্যঞ্জনা বেশ স্পষ্ট।

এম-এল-এ সাহেবের দাপাদাপি তখনও থামেনি। ঘরের মধ্যে থেকেই তিনি চীৎকার করছেন—"ভেবেছেন আমি আপনাকে চিনিনি। পুলিসে খবর দেবো আমিও।"

লখনলাল বলে—"করছেন কি আপনি ইয়েমইয়েলিয়ে-সাহাব! সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত মেজাজ দেখাচ্ছেন। ভোটার-ভোটারীরা মনে করবে কী!"

দুই একটা চিন্তার রেখা যেন পড়ল তাঁর কপালে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর দাপাদাপি সব বন্ধ হয়ে গেল। চাপা গলায় বচ্‌কন্‌ মহতোর দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন—"ইলেক্‌শানটা একবার হয়ে যেতে দাও। তারপর এই মৌলবীটাকে নাকখত দিইয়ে ছাড়ব।"

তারপর আবার সকলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসলেন ভোটারদের মন পাবার আশু উপায় সম্বন্ধে। আলোচনা যেখানে স্থগিত করা হয়েছিল, ঠিক তার পর থেকে আরম্ভ হল। অর্থাৎ গুরুদেবের প্রসঙ্গ থেকে। সর্ববাদি-সম্মতভাবে স্থির হয়ে গেল যে 'স্লোগান' পালটাতে হবে। স্বামী সহস্রানন্দকে লক্ষ্য করেই এগোতে হবে অতি সতর্কতার সঙ্গে। ভোটারচরণদাসকে হতে হবে গুরুচরণদাস। এইবার স্নানাহারের জন্য উঠতে হয়। লখনলালজী জয়ধ্বনি দিল—"বোলো একবার গুরুচরণদাসজীকী জয়।" সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে —Don't ঘাবড়াও গুরুচরণদাসজী।"

বিকালের দিকে এম এল এ সাহেব, লখনলাল, আর বচ্‌কন্‌ মহতো, ফল-মূল, পেঁড়া, সন্দেশের ভেট নিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে গিয়ে হাজির জগদ্‌গুরু শ্রীসহস্রানন্দের আশ্রমে।

আজ বোধহয় আশ্রমে কোন এক বিশেষ পর্বের দিন। গেটের দুই পাশে কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। সম্মুখের রাস্তা, কম্পাউণ্ড, বারান্দা লোকে-লোকারণ্য। ভক্ত স্ত্রী পুরুষ বালকবালিকা, দর্শক প্রার্থীর ভিড় ঠেলে ঠেলে ভিতরে ঢোকা শক্ত। কিন্তু আনন্দউৎসবের দিনের লোকজনের সেই প্রাণবন্ত লীলা-চাঞ্চল্য এখানে অনুপস্থিত। গুরুদেবের সাধন-ভজনের ব্যাঘাত হবে বলে কি এখানে কথাবার্তা বলা বারণ? প্রশ্নভরা চাউনি নিয়ে এম-এল-এ সাহেব তাকালেন নিজের সঙ্গীদের দিকে। লখনলালজীও তাঁরই মত বিস্মিত হয়েছে। তার কাছেও জিনিসটা অপ্রত্যাশিত। অঘটন কিছু ঘটল নাকি? বিষাদের ছায়া? স্বামীজী কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন? সকলের মুখ-চোখে উৎকণ্ঠার ছাপ কেন? আজকে এখানে আসাই বুঝি ব্যর্থ হল! এখানকার প্রাপ্তবয়স্করা সকলেই যে তাঁর ভোটার। সকলেই তাঁর পরিচিত; তারাও নিশ্চয়ই তাঁকে চেনে; কারও মুখে সে পরিচিতির সাড় নাই। কিছু জানবার কৌতূহলটুকুও যেন এরা হারিয়েছে। এ-রকম পীঠস্থানে কারো কাছ থেকে কোন রকম সম্মান পাবার আশা নিয়ে তিনি আসেননি। তবু হেসে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, নিরুত্তর থেকে শুধু ড্যাবড্যাব করে তাকানো, এ জিনিস তাঁর কল্পনারও বাইরের। সম্মুখের এই ভদ্রলোকের মেজ ছেলেটি—তাঁর চেষ্টাতেই গত বছর মেডিকেল কলেজে ভরতি হতে পেরেছে। পাশেই এই যে লোকটি মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, একে দুই বছর আগে তিনি 'কণ্ট্রোল'-এর গমের দোকান পাইয়ে দিয়েছিলেন। যারা চোখ বুঁজে, হাত জোড় করে বসে রয়েছে, তারা না হয় দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু এরা তো দেখতে পাচ্ছে তাঁকে। দেখেও না দেখবার ভান করছে কেন এরা? লোক চরিয়েই খান তিনি। রাজনীতিক জীবনে বহু লোকের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয় প্রত্যহ। কেউ হাঁ করবার আগেই তিনি বুঝে যান লোকটা কী বলবে। কিন্তু এখানকার এতগুলি 'ভোটার' 'ভোটারীর' হঠাৎ কী হল, সেইটা বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারছেন না; সবাই মিলে তাঁকে একঘরে করে, তাঁর সঙ্গে কথা বন্ধ করবার পণ করেছে

নাকি ? বোঝা যাচ্ছে না কিছু। একটা আচমকা আঘাতে এরা সকলে যেন থ হয়ে গিয়েছে। নইলে এরাও তো দেখা যাচ্ছে তাঁরই মত ফল-মূল মিষ্টির থালা সাজিয়ে এনেছিল। কারো, কারো হাতে আবার টিফিন-কেরিয়ার ! রান্না করা জিনিস নাকি ওর মধ্যে ? স্বামীজী তো শুধু ফল-মূল খান ! ওগুলো বোধ হয় তাহলে তাঁর সঙ্গীদের জন্য।

অবস্থা প্রতিকূল দেখে পিছপা হবার লোক তিনি নন। চোখ বুঁজে দরাজ গলায় 'জয় গুরুদেব' বলে চেঁচিয়ে উঠে, সম্মুখের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল। আচম্বিতে দৈববাণী হলেই এক বোধহয় এখানকার ঝিমিয়ে পড়া পরিবেশ এরকমভাবে হঠাৎ জেগে উঠতে পারত। মূক ভক্তবৃন্দ হঠাৎ যেন তাদের কণ্ঠস্বর আর মনের বল ফিরে পেল। সমবেত কণ্ঠস্বরে গুরুদেবের জয়ধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। 'ভোটারীদের' মিহিগলা স্বর মেলাচ্ছে 'ভোটারদের' মোটা গলার সঙ্গে। জনতাব উৎসাহ ও উদ্দীপনার আবেশ-লাগা এই সামূহিক কণ্ঠস্বর, এম-এল-এ সাহেবেব অতি পবিচিত।

নিদারুণ সঙ্কটে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভক্তবৃন্দ হঠাৎ একটা আঁকড়ে ধরবার মত ধ্বনির আশ্রয় পেয়ে বর্তে গিয়েছে।

পবন অনুকূল। ভক্তবৃন্দের সশ্রদ্ধ, সপ্রশংস-দৃষ্টি চরণদাসজী অনুভব করতে পারছেন তাঁর সর্বশরীরে। বিমল আনন্দের উদ্ভাস লেগেছে তার মুখমণ্ডলে। এতক্ষণে তিনি চোখ খুললেন। সত্যিই সবাই তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। সে দৃষ্টিতে পরিচিতির আভাস আবার জেগেছে। সকলে যেন এতক্ষণে চিনতে পারল তাঁকে, এখনকার মহামান্য ইয়েমিয়েলিয়েসাহাব বলে। তাদের গোষ্ঠীরই একজন। গুরুভাই। আপনাব জন। বড ভাই। ইয়েমিয়েলিয়ে-ভাইয়া। এঁর সঙ্গে প্রাণ-খুলে কথা বলা চলে।

চরণদাসজী বললেন—"জয় গুরু !"

মেডিকেল কলেজের ছাত্রটির পিতা 'জয় গুরু' বলে প্রত্যভিবাদন করে, আরও কাছে ঘেঁষে এলেন তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য।

চরণদাসজীরা প্রোগ্রাম করেছিলেন যে, এখানে এসেই নাটকীয়ভাবে সহস্রানন্দ স্বামীর পা জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু এখানে পৌছবার পর, স্বামীজীর

ঘরের দরজা বন্ধ দেখে হতাশ হয়েছিলেন। এখন মনের বল ফিরে পেয়েছেন।

ভদ্রলোকটি এম-এল-এ সাহেবকে বললেন—"ফল-মূল মিষ্টিগুলো আপনি ওই সম্মুখের বারান্দায় রেখে দিন। কোনও জিনিস গৌলমাল হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সে বিষয়ে।"

"দর্শন পাওয়া যাবে না এখন ?"

"সন্দেহ। কথা আছে এর মধ্যে। শোনেননি আপনি এখনও ?"

"না তো।"

কণ্ট্রোলের দোকানধারী লোকটি এরই মধ্যে কখন যেন তাঁর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁর সঙ্গে একটি কথা বলতে পাবার লোভে।

"মায়লে-ভাই, বিপদে পড়ে আপনার কথাই আমাদের মনে পড়ছিল এতক্ষণ।"

"আমার কথা ? মায়লে আমি ঠিকই ; পথের ময়লা ; ড্রেনের ময়লা। অতি নগণ্য মায়লে আমি। আমাকে আপনারা স্মরণ করতে পারেন এতো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন আদেশ করুন। সামান্য কাঠবেড়ালিও শ্রীরামচন্দ্রজীকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল। এই নগণ্য মায়লেও যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না। ফলাফল গুরুদেবের হাতে। জয় গুরুদেব !"

সকলে বলল, 'জয় গুরুদেব।'

তারপর মায়লেভাই এঁদের মুখে সব শুনলেন। উৎকট পরিস্থিতি। সমূহ বিপদ। সব বুঝি যায়। ত্রিভুবন রসাতলে গেল বুঝি এইবার ! তাঁর দরকার নাই, দরকার আমাদের। নিজেদের প্রয়োজনেই আমরা ভগবানকে আঁকড়ে থাকি। নররূপ নিয়েছেন বলেই কি আমরা ভগবানকে নিয়ে যা নয় তাই করতে পারি ? আমাদের চোখের সম্মুখে ভগবানকে টেনে পাঁকে ফেলা হবে ; আর আমরা তাই পুটপুট করে তাকিয়ে দেখবো কেবল ? যশ, মান, ধর্ম, কর্ম, ভাল মন্দ সব কিছুরই ভার মায়লে-ভাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে ভেবেছিলাম পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত থাকব, কিন্তু আপনি আমাদের মধ্যে থাকতে এখানে এ কী অনর্থ ! সঙ্কটে পড়লে আমরা সকলে গুরুদেবের স্মরণ নিতে অভ্যস্ত। একমাত্র সেইখানেই প্রাণ খুলে নিজের সব কথা বলা যায় ; বলে বুকের বোঝা

হাল্কা করা যায়। তারপর তাঁর আদেশমত চলে, বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারা যায়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে উপায় যে নাই। এ কথা যে তাঁর কাছে তুলতে বাধে। গুরুদেবের কাছে কিছু বলতে বাধা উচিত নয়—তবু বাধে; দুর্বল মানুষ আমরা। অবশ্য তিনি জানতে পারেন সব; হয়ত তিনিই আমাদের দিয়ে এ-কথা আপনাকে বলাচ্ছেন। নিদ্রায় জাগরণে সব সময় যে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে আমাদের উপর। এই কৃপাটুকু না থাকলে কি আমরা বাঁচি! আপনি তো শুধু এখানকার মায়লে নন আপনি যে ব্যথার ব্যথী। আপনি যে ভক্ত লোক, সে কথা আর কে জানে না দাদা!"

"আমাকে আর ভক্ত বলে লজ্জা দিও না ভাই। ভক্ত হওয়া কি চাড্ডিখানি কথা। না আছে সে মন, না আছে সে সময়। সাধে কি লোকে আমাদের মায়লে বলে।"

মায়লে ভাই তারপর সব শুনলেন। এঁদের বিপদের যথার্থ প্রকৃতিটা বুঝতে একটু সময় লাগল, তাঁর মত বুদ্ধিমান লোকেরও। বোঝবার পর স্তম্ভিত হলেন। এতো শুধু ভক্তের অনুরোধ নয়; এযে 'ভোটার' 'ভোটারীদের' আদেশ! বললেন—"এতো কারও একার বিপদ নয়; বিপদ যে সমগ্র গোষ্ঠীর। এ বিপদ আমার, আপনার, সকলকার। সমাজের বিপদ; দেশের বিপদ। আমি তো সমাজের বাইরের লোক নই—আমি যে আপনাদেরই একজন। আমি কি চুপ করে বসে থাকতে পারি, এ-কথা আপনাদের মুখে শোনবার পর?"

স্ত্রী-পুরুষ সকলে মায়লে ভাইয়ের কাছে আসতে চায়, সকলে তাঁর মুখের আশ্বাসবাণী শুনতে চায়। সকলে এমনভাবে তাঁকে ঘিরে ধরেছে যে নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম।

তিনি আশ্বাস দিলেন—"চেষ্টার ত্রুটি আমি রাখব না। এর জন্য দিল্লী পর্যন্ত যদি যেতে হয় তা আমি যাব।"

লখনলাল ভরসা দিল—"সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত আমরা লড়ব।"

বচ্‌কন্‌ মহতো চেঁচিয়ে বলল—"দরকার হলে অনশন করব আমরা সেন্সাস অফিসারের বাড়ির দোরগোড়ায়। সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করে দেবো সেন্‌সাস্‌ অফিসে। আরও কত কি আমরা করতে পারি। চাই শুধু

আপনাদের নৈতিক সমর্থন। আপনাদের চোখে আজ যে আগুন দেখতে পাচ্ছি, সেই আগুন আমরা ছড়িয়ে দেবো সারা দেশে।"

পায়ের ঠোকর মেরে তাকে থামাতে হয়। বক্তৃতা একবার আরম্ভ করলে সে থামতে জানে না।

লখনলাল জয়ধ্বনি দিল—"বোলো একবার শ্রীসহস্রানন্দ স্বামীজিকী জয়!"

বচ্‌কন্‌ মহতো হাত তুলে লাফিয়ে উঠে ইনকিলাব জিন্দাবাদের ধরনে চেঁচাল—"ঔর ভী একবার বোলো গুরু মহারাজকী জয়!"

লখনলাল বলল, "এ সম্বন্ধে এখন একটা কাজের প্রোগ্রাম ঠিক করতে হয়।"

বচ্‌কন্‌ মহতো এ কথায় সায় দিল। "প্যারে ভাইয়ো আওর বহনে! আমি প্রস্তাব করছি যে আপনারা সকলে যে যেখানে আছেন বসে পড়ুন। তারপর পাচ মিনিট শ্রীগুরুজী ভগবানের ধ্যান করুন, চোখ বুঁজে। আমরা ততক্ষণ একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলি। আপনাদের ধ্যানের একাগ্রতার উপরই আমাদেব প্রোগ্রামের সাফল্য নিভর করবে।"

"ইয়েমিয়েলিয়ে-সাহাব আর আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।"

"শান্তি! শান্তি!"

সকলে চোখ বুঁজে বসেছে। সম্মুখের ঘরের বন্ধ দরজা মনে হ'ল যেন ইঞ্চিখানেক ফাঁক হ'ল। ধোঁয়া বার হচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠেছে। নিমীলিতচক্ষ ভক্তবৃন্দ আসন্ন সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার আশ্বাস পাচ্ছে প্রতিবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই সৌরভ বুকে টেনে নেবার সময়।

ফিস ফিস করে পরামর্শ হচ্ছে নূতন প্রোগ্রাম সম্বন্ধে। পরিস্থিতি বদলেছে সে বিষয়ে কারও মতদ্বৈধ নাই। "স্লোগান পালটাতে হবে ইয়েমিয়েলিয়ে-সাহাব।"

চরণদাসজী বললেন—"গুড় দিয়েই যদি মাছি মরে তবে আর তিত ওষুধ ব্যবহার করবার দরকার কি!"

লখনলাল বলে—"গুরুচরণদাসজীকে এবার হতে হবে মৌলভীচরণদাস। এ না করে উপায় নাই।" সর্ববাদিসম্মতভাবে প্রোগ্রাম স্বীকৃত হয়ে গেল। বচ্‌কন্‌ মহতো চেঁচাল—"বোলো একবার—"।

পাছে আবার বেফাঁস কিছু বলে ফেলে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি পাদপূরণ করে দিল লখনলাল—"গুরু-চরণ-কমলো কী জয় !"

এই জয়-ধ্বনি ভক্তদের ধ্যান ভাঙ্গাবার নোটিস। রেডি! আর দেরী করবার সময় নাই মোটেই! সব 'অওল রায়েট' হবে যাবে! শুধু "বোলো একবার—সহস্রানন্দ স্বামীজী কী জয় !"

অগণিত নরনারীর মিছিল বার হ'ল সহস্রানন্দ স্বামীর আশ্রমের গেট থেকে। সবচেয়ে আগে আগে চলেছেন চরণদাসজী। সকলেই চিন্তাভারাক্রান্ত; শুধু লখনলালজী ও বচ্‌কন্‌ মহতো বাদে। তাদের আশ্বাসে কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তাই সকলে গুরুদেবের নাম স্মরণ করতে করতে চলেছে। এ সংসারে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কিছু যে হবার উপায় নাই! আর ভরসা, মায়লে ভাইয়া (মায়লেদা) !

মায়লে-ভাইয়া নিজে কিন্তু মোটেই ভরসা পাচ্ছেন না। মৌলবীটোলার কাছে গিয়ে এক গাছতলায় এই নীরব শোক-মিছিলকে থামতে বলল লখনলাল !

"এখান থেকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব একাই যাবেন সেই বদ মৌলবীটার বাড়িতে।"

"প্যারে ভাইয়ো ঔর বহনে! মায়লেজীর উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় সেজন্য আসুন আমরা সকলে মিলে ততক্ষণ এই গাছতলায় বসে গুরুদেবের নাম জপ করি। জয় গুরু জয় গুরু; মায়লেজী আর দেরী করবেন না আপনি।"

বহু রকম বিষয়ের তদ্বির এম-এল-এ সাহেব জীবনে করেছেন। কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই! চরণদাসজীর পা কাঁপছে। হাইকম্যাণ্ডের নাম স্মরণ করেও মনে বল পাচ্ছেন না তিনি। মৌলবীসাহেব বাড়ির বারান্দায় গড়গড়া টানছিলেন। দা-কাটা তামাকের গন্ধ অনেক দূর থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালেন মৌলবীসাহেব।

"আসুন, আসুন, এম-এল-এ সাহেব। সেলামালেকুম্‌ !"

ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝবার আগেই, চরণদাসজী গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের উপর। বেশ করে জড়িয়ে ধরেছেন পাজামা সম্বলিত পা দুখানা। "করেন কি, করেন কি, এম-এল-এ সাহেব !"

তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না—যতক্ষণ না মৌলবীসাহেব কথা দিচ্ছেন যে তাঁর একটা অনুরোধ রাখবেন।

"না না, আপনি আমার গরীবখানায় পদার্পণ করেছেন তাতেই হয়ে গিয়েছে। সে পুরনো কথা আর তোলবার দরকার নেই। ছাড়ুন! উঠুন উঠুন। এই চেয়ারে বসুন!"

"না, আপনি আগে কথা দেন।"

"বলছি তো। আপনি এসেছেন সেই যথেষ্ট। আর মাপ চাইতে হবে না। রাগের মাথায় লোকে কত সময় কত কি বলে ফেলে। সে সব কথা কি ভদ্রলোকে মনের মধ্যে গিঁঠ দিয়ে বেঁধে রাখে চিরকালের জন্য?"

"আপনি কথা দেন, আগে।"

"কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছেন বারবার। যা হবার হয়ে গিয়েছে। পা ছাড়ুন!

কথা আদায় করে চরণদাসজী উঠে দাঁড়ালেন। জানালেন—"এখানকার সকলে আজ অতি বিচলিত। এত বড় বিপদ তাদের জীবনে কখনও আসেনি। এ বিপদ থেকে সকলের উদ্ধার করতে পারেন, একমাত্র আপনি। রাখলে রাখতে পারেন, মারলে মারতে পারেন।

"আমি?"

"হ্যাঁ, আপনি।"

"খোদা হাফেজ! বলেন কী!"

সন্দিগ্ধ মৌলবীসাহেব জোরে জোরে নিশ্বাস টানলেন দুইবার, এম-এল-এ সাহেবের মুখ থেকে কোনরকম গোলমেলে গন্ধ বার হচ্ছে কিনা তাই পরখ করবার জন্য। না পেয়ে উদ্বিগ্ন হলেন আরও বেশী।

"বলছি। বলবো বলেই তো এসেছি। এক কথায় বলবার মত নয় ব্যাপারটা। খোদা আপনার মঙ্গল করবেন। আজ আপনি সামান্য ব্যক্তি নন। এতগুলি লোকের জীবন-মরণ স্বর্গ-নরক নির্ভর করছে আপনার কলমের এক খোঁচার উপর। সবাই আপনার মুখ চেয়ে রয়েছে।"

"বলুন না, কি করতে হবে!"

এতক্ষণে চরণদাসজী আসল কাজের কথাটা পাড়লেন। গলার স্বর কাঁপছে। মৌলবীসাহেবের বিবেকে বাধতে পারে; সেইটাই তাঁর আসল ভয়।

"মৌলবীসাহেব, আজ সকালে আপনি স্বামী সহস্রানন্দের আশ্রমে গিয়েছিলেন লোক গণনার কাজে। সেই সম্বন্ধেই কথাটা। সেখানে আশ্রমের বাসিন্দাদের গোনবার সময় স্বামীজীকেও গুণে ফেলেছেন। আপনার ফাইলে মানুষদের মধ্যে থেকে তাঁর নামটা কেটে দিতে হবে। তিনি তো মানুষ নন, তিনি যে দেবতা, তিনি যে ভগবান!"

মৌলবীসাহেবের অন্যমনস্কভাবে দাড়ি চুলকানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

॥ দাম্পত্য সীমান্তে ॥

মাছি ছোটে দূষিত ক্ষতের গন্ধ পেয়ে। নিবারণও চেষ্টা-তদবির করে বদলি হয়েছিল আজবপুর পোষ্টাফিসে। ডাক-তার-বিভাগের খবর, সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় পার্সেল, বিলি না হয়ে ফেরত যায়, এই পোষ্টাফিস থেকে।

সত্যই আজব জায়গা আজবপুর। আধখানা পড়ে ভারতে, আধখানা নেপালে। নেপালের লোক এই স্টেশন থেকে রেলগাড়িতে চড়ে; এখানকার পোষ্টাফিসে চিঠি ফেলতে আসে। এখানকার লোক নেপালে বাজার করতে যায়; মদ খেতে যায়। কাজেই এখানকার লোকের চালচলনও অন্যরকমের। এরা ভোজালি দিয়ে তরকারী কোটে; পুলিসের লোক দেখলে ভয় পায় না; আবগারী-বিভাগের লোক দেখলে হেসে পানের দোকানে নিয়ে যায়। এইরকম আবহাওয়াই নিবারণ পোষ্টমাষ্টারের পছন্দ।

অসীমার পছন্দ নয়; কিন্তু উপায় কি। যেমন মানুষের হাতে মা বাপ তাকে সঁপে দিয়েছে! ছোটবেলায় ঠাকুমা নাতনীকে ঠাট্টা করে বলতেন—দেখিস, তোর সঙ্গে এমন বরের বিয়ে দেবো যে, সে রাতে মদ খেয়ে এসে তোকে লাঠিপেটা করবে। অসীমা বলত—'ইস্! ঝাঁটা মেরে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবো না!' তার কপালে ঠাকমার কথাই ফলল শেষ পর্যন্ত! বিয়ের পর প্রথম যেদিন জানতে পারে স্বামীর নেশা করার কথা, সেদিন খুব কেঁদেছিল। অমন সুন্দর যার চেহারা, সে মানুষে আবার মদ খায়!

তারপর গত সাত বছরে আরও কত কি জেনেছে, কত কি শিখেছে, কত কি করেছে। যার স্বামীর নেশার খরচ মাইনের চেয়েও বেশী, তাকে অনেক কিছু নতুন করে শিখতে হয়। ইচ্ছা থাক, আর না-ই থাক।

এখানকার লোকে পোষ্টমাষ্টারকে মাষ্টার-সাহাব বলে। সেইজন্যই বোধহয় সে প্রথম রাত্রিতেই স্ত্রীর উপর মাষ্টারি ফলিয়েছিল, শিখিয়ে

পড়িয়ে তাকে একটু চালাক-চতুর করে নেবার সদুদ্দেশ্যে। বলেছিল, "হাবাতেদের সঙ্গে খবরদার আলাপ কর না! আলাপ পরিচয় করতে হয় ত বড়লোকের সঙ্গে। যার হাতে কিছু আছে, তার হাত থেকেই না কিছু আসতে পারে। আমল না পেলেও বড়লোকের বাড়ির আড্ডার এক কোণায় আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি প্রত্যহ, খবরের কাগজের উপর মুখ গুঁজে। সময়ে কাজে লেগেছে।"

তখনই অসীমার মনে হয়েছিল—এমন কার্তিকের মত যার চেহারা, স্বভাব তার এমন কেন? আগে থেকে এত মতলব ফেঁদে কি সবাই কাজ করতে পারে?

যে স্বামী প্রথম রাত্রিতেই এই কথা বলে; সে যে শুধু মুখের উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত থাকবে না, এ জানা কথা। এখানে আসবার পরই নেপাল বাজারের শেঠজীকে একদিন বাড়িতে এনে পরিচয় করিয়ে দিল অসীমার সঙ্গে। তারপর একটু চায়ের জল চড়াতে বলে বেরিয়ে গেল থলে নিয়ে বাজার করতে। ফিরল ঘণ্টা দুয়েক পর।

উপরওয়ালা 'ইন্সপেক্‌শন'এ এলে, তার জন্যও হুবহু এই ব্যবস্থা।

এ স্বামীকে চিনতে কি কারও দেরি লাগে। সবচেয়ে খারাপ লাগে তার সম্বন্ধে স্বামীর এই নিস্পৃহতার ভাব। সে দেখতে সুরূপা নয়। সেই জন্যই বোধহয় তার মনের এই দিকটা আরও বেশী স্পর্শাতুর। তবে নিবারণ রাত্রিতে আটটার মধ্যে বাড়ি ফেরে, এত দুঃখের মধ্যেও এইটাই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

কিন্তু আজ হল কি?

সমীর ঠাকুরপো সেই সাড়ে সাতটা থেকে যাই যাই করছে। সে বলেছে—'বস না। এত কি বাড়ি যাবার জন্য তাড়া পড়েছে! তবুতো এখনও বিয়ে করনি। তোমার দাদাকে আসতে দাও, তারপর যেও।'

বেশ লাগে তার সমীর ঠাকুরপোর সঙ্গে গল্প করতে। রেলস্টেশনের মালবাবুর ভাই। আই কম পাস করে চাকরির চেষ্টা করছে। রোজ আসে। রান্নাঘরে বসে বউদির সঙ্গে গল্প করে।

আটটা বাজল, নটা বাজল। তবু নিবারণের ফেরবার নাম নেই। অসীমা

জানে যে নিবারণ আজ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আজ কি
কাঁচা পয়সা সে হাতে পাবে। সেইজন্যই দেরি হচ্ছে না তো? ছ বছরের ছে
ফনটে; সে অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারবে কেন। খাওয়া হ
সবাই এল শোবার ঘরে। ঘরের কোণায় স্বামীর খাবার ঢেকে রেখে আব
তারা বসল সুখ দুঃখের গল্প করতে। জিমি কুকুরটা অনবরত ডাকছে।

দশটা বাজল। তবু নিবারণ আসে না। মশারির ভিতর কেন
ফনটের ঘুম আসছে না আজ কিছুতেই।

"কটায় খাও তুমি রোজ ঠাকুরপো?"

"ঘরে রুটি ঢাকা থাকে, যখন খুশি খাই।"

"তবে আর এত উসখুস করছ কেন, যাবার জন্য?"

"না, অনেক রাত হল। দাদার আজ হল কি?"

"কে জানে! কোথাও কোন ড্রেনেটেনে পড়ে রয়েছে বোধহয়!"

কথার মধ্যে বিরক্তি সুস্পষ্ট। নিবারণের মদ খাওয়ার কথা এখা
সবাই জানে। একথা বলতে সমীর ঠাকুরপোর কাছে লজ্জা নাই। পা
আবার সমীর নিবারণের বাইরে রাত কাটানর অন্য অর্থ করে নেয়; সেইজন্য
অসীমা মদ খাওয়ার দিকটার উপর জোর দিয়ে কথাটা বলল। স্বামী
বাইরে রাত কাটায়, একথার জানাজানিতে শুধু বাইরের লোকের কাছে
লজ্জা নয়, নিজের কাছেও নিজে ছোট হয়ে যেতে হয়।

হঠাৎ অসীমার খেয়াল হল যে, ফনটের সম্মুখে তার বাপের ম
খাওয়ার গল্প করাটা ঠিক নয়। "চল ঠাকুরপো, আমরা গিয়ে বসি
কিরে ফনটে তোর ভয় করবে না তো আমরা ওঘরে গিয়ে বসলে;
মাঝের দরজা তো খোলাই থাকল।"

মাঝের দরজা খুলে তারা গিয়ে বসল পোস্টাফিসের ঘরে। "জিমি
চুপ করলি না! জ্বালাতন!"

এই মানসিক অবস্থা; এমন দরদী শ্রোতা; নিজের দুঃখের কথা
বলবার সময় অসীমার চোখের জল বাধা মানেনি। এগারটার পর সে
নিজে থেকেই সমীরকে চলে যেতে বলেছিল। যাবার সময় সমীর আশ্বাস দিয়ে
গিয়েছিল—"দাদা রাত্রিতে আসবেন ঠিকই। বারোটা, একটা হতে পারে।"

"সে তো নিশ্চয়ই।"

বলেই নিজের কানেই বেখাপ লাগল কথাটা। এত জোর দিয়ে ওকথা বলবার কোন দরকার ছিল না। শুধু সমীরকে কেন, নিজের মনকেও সে ফাঁকি দিতে চায়। নিজেকে স্তোক দেবার জন্য ঘরের আলোটা শোবার আগে নেবাল না। নেবানর অর্থ হত, নিবারণ যে আজ আসবেও না, খাবেও না, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ।......খাটের তলায় ইঁদুর খুটখুট করে। ডাকঘরে ঘড়ি বাজে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে কত কি ভাবে ; আর চোখের জলে বালিশ ভেজে সারারাত।......পণ্যমূল্যের অতিরিক্ত তার কি আর কোন দামই নাই স্বামীর চোখে ?......
স্বামী সব চেয়ে বেশী ভালবাসে মদ। তারপর টাকা। কিন্তু তারপর ?...

জিমিটারও আজ হল কি ? সেও সারারাত ডেকে ডেকে সারা।

শেষ রাত্রিতে চোখের পাতা কখন যেন বুজে এসেছিল। ঘুম ভাঙ্গল হঠাৎ। এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। ফনটে হাত দিয়ে ঠেলছে। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ। মনের তিক্ততা ঘুমিয়েও কাটেনি। কড়ানাড়ার শব্দের অধীর রূঢ়তা, মেজাজ আরও খারাপ করে দেয় অসীমার।

"জেগে রয়েছিস—উঠে দরজাটা খুলে দিতে পারিস না ! বুড়ো ধাড়ি ছেলে !"

চুল ধরে টানাটা এত অপ্রত্যাশিত এই ভোরবেলাতে যে ফনটে কাঁদতে ভুলে গেল।

...রামদেনীর মা কড়া নাড়লে এর আগেওতো কতদিন মাকে ডেকে তুলে দিয়েছে। তারজন্য কোনদিন তো মাকে রাগ করতে দেখেনি।...... মশারি থেকে বেরিয়ে, দুমদুম করে পা ফেলে মা দরজা খুলে দিতে গেল। খটাং করে শব্দ হল। রাগ করে খিল খুললে ওই রকম শব্দ হয়। জিমিটা নিশ্চয়ই ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওকি ! মা এমন দৌড়িয়ে ঘরে ঢুকলো কেন ? বিড়াল আসেনি তো।...মা খপ করে একখান পুরনো খবরের কাগজ টেনে নিল। ঢাকা তুলে বাবার জন্য রাখা ভাতগুলোকে খবরের কাগজের উপর ঢালছে। খবরের কাগজে আবার ভাত রাখে নাকি লোকে ? জিমির জন্য নিশ্চয়ই। মা আড়চোখে দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

মা মিছামিছি ভয় পাচ্ছে, জিমি বুঝি এখনই ঘরে ঢুকে ওই ভাত খেয়ে নেবে। জিমি যে চলে গিয়েছে বাইরে।...

মশারির ভিতর থেকে ফনটে সব দেখছে। যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। মার কাণ্ডকারখানা আজ সে ঠিক বুঝতে পারছে না।

......একমুঠো ভাত মা আবার থালায় রাখল। ডাল তরকারী দিয়ে মেখে সেই ভাতের দলাটাকে সারা থালার উপর একবার বুলিয়ে নিচ্ছে। ডাঁটা চড়চড়িটা থালার একপাশে রেখে আঙ্গুল দিয়ে একটু ছড়িয়ে দিল। মা দরজার দিকে তাকাচ্ছে ভয়ে ভয়ে। একবার মশারির দিকেও তাকাল। ওকি! মা ডাঁটা চিবুচ্ছে! এই সাতসকালে! বাসিমুখে! ভুল দেখছে নাকি সে? না, ওই তো ডাঁটার ছিবড়ে বার করে থালার ওপর রাখলে। মা তার মশারির দিকে তাকাচ্ছে। এরকম সময় মার দিকে তাকাতে নাই; লজ্জা পাবে। তাই ফনটে চোখ ফেরাল জানলার দিকে। রামদেনীর মা আসছে জানলার দিকে।...

অসীমা সত্যিই তাকিয়েছিল মশারির দিকে। সে দেখছিল, বাইরে থেকে বোঝা যায় নাকি, এখন মশারির ভিতর কে আছে, না আছে। না। যাক! তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে কোথায় অসীমা। মুহূর্তের মধ্যে সে কতদিক সামলাবে। তার মত অবস্থায় যে পড়েছে সে-ই জানে। সে বুঝতে পারেনি যে দরজার কড়া নাড়ছিল রামদেনীর মা। ভেবেছিল বুঝি ফনটের বাবা। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গবার পর ঠাহর পায়নি। ভাগ্যে ঠিকেঝি রামদেনীর মা কোনদিনই শোবারঘরে ঢোকে না।

জল খানিকটা মেঝেতে ফেলে, ডালতরকারি-মাখানো হাতটা ডুবিয়ে ধুয়ে নিল গ্লাসের মধ্যে অসীমা। রামদেনীর মা দোর-গোড়ায়। এঁটো থালা-বাসনগুলো তার হাতে দেবার সময় অসীমা চোখ নামিয়ে নেয়। কুয়াতলায় মুখ ধুতে যাবার আগে শোবার-ঘরের দরজা আবজে দিতে ভোলে না। স্বামী রাত্রিতে ফেরেনি এই কথাটা ঝিকে জানতে দিতে চায় না সে।

বীরবাহাদুর নেপালী বাইরে থেকে ডাকে "মাইজী!"

এই ডাকঘরের ঠিকানায় নেপাল এলাকার যে সমস্ত চিঠিপত্র আসে, সেগুলোকে ঘরোয়া ব্যবস্থায় বিলি করবার জন্য বীরবাহাদুর প্রত্যহ নিয়ে যায়।

তার কাঁধে ডাকের ঝুলি। জিমি লেজ নাড়তে নাড়তে তার গায়ে ওঠবার চেষ্টা করছে। রামদেনীর মা কাজ সেরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। বীরবাহাদুরকে বলে গেল—"আজ বোধহয় একটু দেরি হবে মাস্টারসাহেবের। এখনও ঘুমুচ্ছে। কাল রাতে বোধ হয় চলেছে খুব।" বোতল থেকে মদ ঢালবার মুদ্রা দেখিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়।

অসীমা এসে দাঁড়িয়েছে।

"বীররাহাদুর, তুই একটু ঘুরে ঘেরে আয়।"

ঠোঁটের কোণায় হাসি এনে চোখের ইশারায় বীরবাহাদুর বুঝিয়ে দিল যে রামদেনীর মা বহুদূরে চলে গিয়েছে; অত সাবধান হয়ে কথা বলবার দরকার আর নাই।

"মাস্টারসাহেবের কথাতেই তাড়াতাড়ি এলাম সাইকেলে। তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। হেঁটে আসছেন কিনা।"

কেন তাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছে সেকথার কোন মূল্য নাই অসীমার কাছে।

"দেখা হল কোথায়, মাস্টারসাহেবের সঙ্গে?" জিজ্ঞাসা করবার সময় কুণ্ঠায় বীরবাহাদুরের মুখের দিকে সে তাকাতে পারে না।

"আমার বাড়িতেই তো তিনি সারারাত।"

মনটা হালকা হালকা লাগে।

"সারা-রাত?"

বীরবাহাদুর অধৈর্য হয়ে পড়েছে। মাথায় তার গুরুদায়িত্ব! ডাকের থলে থেকে একটা পার্সেল বার করতে করতে বলে—"এটাকে দেবার জন্য কাল রাতেও একবার এসেছিলাম।"

"রাত্রিতে? ক'টার সময়? কেন? খুব দরকারী নাকি?"

দরকারী না হলে কি আর অত রাতে নিয়ে এসেছিলাম। মাস্টারসাহেব তখন নেশায় চুর। উনি কি তখন আসতে পারেন।"

"তবে রাত্রিতে দিলি না কেন?"

একটু দ্বিধাজড়িত স্বরে সে বলল—"দেখলাম ডাকঘরের মধ্যে আপনি আর মালবাবুর ভাই গল্প করছেন। বাইরের লোকের সম্মুখে তো জিনিসটা

দিতে পারি না আপনার হাতে। রাতদুপুরে পোস্টাফিসের সম্মুখে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকারও বিপদ আছে। তাই চলে যেতে হল। গিয়ে মাস্টারসাহেবকে বলতেই তিনি চটে আগুন মালবাবুর ভাইয়ের উপর। ওই নেশার মধ্যেও, জ্ঞান টনটনে। বলে ভোজালি লে আও বীরবাহাদুর! অভী লে আও! খুন করব ছোঁড়াটাকে আমি! কী চীৎকার! সে কি সামলান যায়!"

শিহর খেলে গেল অসীমার সারাদেহে। বহু আকাঙ্ক্ষিত অথচ অনাস্বাদিত একটা জিনিসের স্বাদ সে পাচ্ছে। খুব ভাল লাগছে শুনতে। ও থামল কেন। আরও বলুক।

ভয়ের অভিনয় করে সে বলে—"তাই নাকি! ওরে বাবারে! তাহলে কী হবে! তাহলে আমি কী করি! তখনই আসছিল নাকি ভোজালি নিয়ে?"

বীরবাহাদুর এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়। "না না, কিছু ভাববেন না, মাইজী। নেশায় যে মানুষ হাঁটতে পারছে না, সে মানুষ তখন আসছে ভোজালি নিয়ে মারতে! আপনিও যেমন!"

"না না বীরবাহাদুর। যত নেশাই করুক, জ্ঞান মাস্টারসাহেবের টনটনে থাকে। জানিতো তাকে।"

"থাকে তো থাকে!"

তাড়া দিয়ে উঠেছে বীরবাহাদুর। বাড়িতে আগুন লাগলেও বাজে গল্প করা ছাড়বে না এই মেয়েমানুষের জাতটা! সে কাজের কথা পাড়ে।

"এই নিন মাইজী পার্সেলটা। সব ঠিক করা আছে। আপনি শুধু সেলাইটা করে রেখে দিন। এখনই। একটুও দেরী করবেন না। মাস্টারসাহেব এই এলেন বলে। এসেই সেলাইয়ের উপরের গালা মোহরগুলো ঠিক করে বসিয়ে দেবেন। শেঠজী রাত দশটার সময় মাস্টারসাহেবের কাছে একটা জরুরী খবর পাঠিয়েছিলেন। সেইজন্যই না এত তাড়া।"

জরুরী খবর? আর বলতে হবে না। মুহূর্তের মধ্যে অসীমা বুঝে গিয়েছে খবরটা কিসের। কেনই বা বীরবাহাদুরকে নিবারণ তখনই পাঠিয়েছিল। আসবার মত অবস্থা থাকলে নিজেই আসত। ইনসপেক্শন

অফিসার ডাকঘর খুলবার সময়ের আগে বোধ হয় আসবেন না। অফিসারদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হয়, সব অসীমার জানা। পার্সেলটা সেলাই করতে আধঘণ্টাও সময় লাগবে না।

"ফনটে, জামাজুতো পরেনে! বীরবাহাদুর ফনটেকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাতো!"

অসীমা ঘরে ঢুকল চুল আঁচড়ে শাড়ি বদলে নিতে। চায়ের জল একটু পরে চড়ালেই হবে।

কিন্তু সময় আর পাওয়া গেল না। সবে সেলাই করতে বসেছে পার্সেলটা—মোটর গাড়ি এসে থামল পোস্টাফিসের সম্মুখে। একখানা ছোট, একখান বড় গাড়ি। এতো কেবল 'ইন্সপেকশন'এর উপরওয়ালা নয়! এ যে অনেক লোক! ডাকবিভাগের অফিসার; আবগারী বিভাগের অফিসার; পুলিসের অফিসার; নিবারণ নিজে; পুলিস কনস্টেবল! পথে দেখা হয়ে গিয়ে থাকবে নিবারণের সঙ্গে। তাহলে তো স্বামীর সমূহ বিপদ! এত বড় বিপদের মুখে অসীমা কোনদিন পড়েনি। হে মা কালী, বাঁচাও! ভয়ে কি করবে ঠিক করতে পারে না। পার্সেলের ভিতরের গাঁজার পুঁটলিটাকে সে কয়লাগাদার নীচে রাখে। পার্সেলের উপরের ন্যাকড়ার মোড়কটাকে উনুনের মধ্যে ফেলে দেয়। হে মা কালী, গালা আর ন্যাকড়াপোড়া গন্ধটা যেন হাওয়ায় পোস্টাফিসের উলটো দিকে উড়ে যায়! এখন একবার নিবারণের সঙ্গে একলা দেখা করতে পারলে সুবিধা হত। বাড়ি ঘিরে ফেলেছে পুলিসে। গুটি গুটি লোক জমতে আরম্ভ হয়েছে। নিবারণ অফিসারদের বলছে—অফিসের চাবি বাড়িতেই আছে; সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি বাড়ি থেকে বার হয়ে যাবার সময়; বাড়ির ভিতর দিয়েও পোস্টাফিসের ঘরে ঢোকবার আর একটা দরজা আছে; বাড়িতে আছে স্ত্রী আর একটি ছয় বছরের ছেলে; আর বাইরের লোকের মধ্যে আসে ঠিকেঝি রামদেনীর মা। পুলিস এখন স্ত্রীর সঙ্গে নিবারণকে দেখা করতে দিতে রাজী নয়। একজন এসে অসীমার কাছ থেকে পোস্টাফিসের চাবি চেয়ে নিয়ে গেল।

ডাকঘরে টেবিলে দুটি চায়ের কাপ। 'এ আবার এখানে কোত্থেকে

এল।' বলেই নিবারণ কাপ দুটোকে টেবিলের নীচে নামিয়ে রাখল। অফিসাররা পার্সেল সংক্রান্ত খাতাপত্র দেখতে চাইলেন।

"কালকের তারিখে, এই যে এত নম্বরের পার্সেল সম্বন্ধে লিখেছেন—এই নামের কোন ব্যক্তি ওখানে নাই—এটা আজ কলকাতায় ফেরত পাঠান হবে প্রেরককে—দেখি সেই পার্সেলটা।"

সিন্দুক থেকে সেটাকে বার করে দিতে গেল নিবারণ। শেষকালে মুখ কাঁচু-মাচু করে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পাশের ঘর থেকে অসীমা সব শুনতে পাচ্ছে। নিবারণ নিজেই প্রথম কথা তুলল—নিশ্চয়ই পার্সেলটা কেউ চুরি করেছে। তার মনে আছে যে সে কাল পার্সেলটা সিন্দুকে রেখেছিল। তারপর সারারাত সে বাড়িতে ছিল না। বাইরের তালা যখন ভাঙ্গা নয়, তখন চোর নিশ্চয়ই ঢুকেছে বাড়ির ভিতর দিক দিয়ে।

বীরবাহাদুরের কাছ থেকে স্বামীর সম্বন্ধে নতুন একটা খবর পাবার পর থেকে, অসীমার মনে নতুন নেশা লেগেছে। আসন্ন বিপদের মুখেও সে নেশার আমেজ কাটেনি। মাঝের খোলা দরজা দিয়ে নিবারণের চোখ মুখের ভাব সে একবার দেখে নিল। মনে হল যেন ঈর্ষার রেশের সন্ধান পাচ্ছে সেখানে। বাড়ির হাটে তার নিজের ফেলা নিজের মূল্যের প্রথম স্বীকৃতি।

অফিসাররা এইবার বাডির ভিতর ঢুকলেন অসীমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য। তার বেশভূষার আড়ম্বর প্রথমেই তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"কাল বিকালের পর থেকে পোস্টাফিসের ঘরে কেউ ঢুকেছিল?"

"না।"

স্বামীর চোখের লেখা দেখবার নেশা তখন অসীমাকে পেয়ে বসেছে।

হাঁ হাঁ করে উঠেছে নিবারণ, কি বলতে হবে, স্ত্রীকে তার ইঙ্গিত দেবার জন্য।

"মেয়েমানুষ। ভয়ে মিছে কথা বলছে হুজুর।"

"মিছে কেন হতে যাবে। কেউ ঢোকেনি ওঘরে।"

"কেউ ঢোকেনি তো দুটো চায়ের কাপ কেন ছিল টেবিলের উপর?"

চটে উঠেছে নিবারণ।

"ও কালকে দুপুরের। তুমি যে দুপেয়ালা চা খেয়েছিলে একসঙ্গে।"

ঘরের বাক্স পেটরা সার্চ করা হল। অফিসার শুধু বললেন—"নতুন নতুন জরিদার বেনারসী শাড়ী আপনার অনেকগুলো দেখছি।"

"হ্যাঁ ওগুলো বিয়ের সময় পাওয়া।"

এছাড়া আর কোন কথা বার করা গেল না অসীমার মুখ থেকে। ফনটেকে ডাকা হল।

টফি, লজেঞ্চুস খেয়ে, সে বলল যে সমীর-কাকা কালরাত্রিতে মার সঙ্গে ওঘরে গল্প করছিল, আর মা মাতালের ভয়ে কাঁদছিল। বাসিমুখে ডাঁটা চিবুবার কথা যে বলতে নাই তা সে জানে। দারোগার প্রশ্নের উত্তরে রাম-দেনীর মা বলল যে, কাল রাত্রিতে সমীর এখানে ছিল।

"তাহলে আপনাদের স্বামী স্ত্রী দুজনকেই থানায় যেতে হয় আমাদের সঙ্গে। আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।"

ফনটেকে অফিসার গাড়ীর সম্মুখে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন। অসীমা আর নিবারণ বসল ভ্যানের পিছন দিকে। পথ থেকে পুলিস সমীরকেও ভ্যানে তুলে নিল। সে বসল একা অন্যদিককার বেঞ্চে। সবাই নির্বাক। ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলেছে। সে ধুলো খেতে খেতে মালবাবু সাইকেল চালিয়ে আসছেন গাড়ির পিছনে পিছনে। সমীর গাড়ির বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার বেঞ্চের দিকটায় ছায়া; আর অসীমাদের বেঞ্চের দিকটায় রোদ্দুর পড়ছে। হঠাৎ অসীমা উঠে সেই বেঞ্চটাতে গিয়ে বসল। ভাবে মনে হল যে সে রোদের হাত থেকে বাঁচতে চায়। বসবার সময় অসীমা স্থির লক্ষ্য রেখেছে নিবারণের চোখের উপর। নিবারণও তার দিকে তাকিয়ে। যাতে পুলিসরা না দেখতে পায় সেইজন্য সে হাতখানা বেঞ্চের নীচে নামিয়ে স্ত্রীকে ইশারা করল সমীরের দিকে আরও ঘেঁষে বসতে। স্ত্রীর উপস্থিতবুদ্ধির প্রশংসাসূচক ব্যঞ্জনাও তার চোখমুখে নির্লজ্জ ছাপ ফেলেছে। ঈর্ষার চিহ্নও নাই সেখানে।

যা ভাবতে ভাল লাগে, সেইটাকেই সত্যি বলে ধরে নিয়েছিল এতক্ষণ অসীমা। এতক্ষণে মিষ্টিভুলের নেশা কাটে। চূড়ান্ত অপমানে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।

"কেন, ওর কাছে ঘেঁষে বসব কেন। 'হুকুম?' অসীমা এসে ধপ করে বসল নিবারণের পাশে। তারপর আবার উঠে দাঁড়াল গাড়ীর পার্টিশনের লোহার জাফরি ধরে।

"শুনছেন পুলিসসাহেব, এই লোকটাই চুরি করেছে—এই ঠগ, জোচ্চোর, মাতালটা। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়, আমাকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়ে। সব সত্যি কথা বলব আমি। আমার জেল হয় হোক। কলকাতার লোকদের সঙ্গে এর, আর নেপালবাজারের শেঠজীর সাট আছে। যেসব লোক সাতজন্মেও এখানকার নয়, তাদের নামে কলকাতা থেকে পার্সেল আসে। এখানে সে নামের লোক পাওয়া যাবে কোথায়। ফেরত যায় সেসব পার্সেল। পার্সেলে আসে রেশমী শাড়ী, টাকা, আরও কত কি। সেসব এই মাতালটার মজুরি। সেটা বার করে নিয়ে এরা পার্সেলের মধ্যে ভরে দেয় নেপালের সস্তা গাঁজা। যে গাঁজার দাম নেপালে চার পয়সা, তার দাম কলকাতায় দেড় টাকা। কলকাতা থেকে যে মিথ্যা পার্সেল পাঠায় সে-ই আবার গাঁজাভরা পার্সেল ফেরত পায়। অনেক দিন থেকে এই করে আসছে এরা। আমার মুখ বন্ধ করবার জন্য আমাকে দিয়ে গাঁজা ভরা পার্সেল সেলাই করায়। যাদের হাতে এত লোকজন, যারা সিলমোহর বাঁচিয়ে সেলাই কাটতে জানে, তারা কি আর সেলাই করবার একটা লোক পেত না ইচ্ছা করলে। শুধু আমার মুখ বন্ধ করবার জন্য আমায় রেশমী শাড়ী দিয়েছে। লোকটা কি কম বদমাইস! তিন বছর পরে কি করবে সেসব ওর আজকে থেকে ছককাটা থাকে। একটা কথাও লুকবো না আমি হুজুর। গলায় পাথর বেঁধে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে মা বাপে! বিয়ে না ছাই! ইচ্ছা করে যেখানে দুচোখ যায় চলে যেতে! পারিনি শুধু ফনটেটার মুখ চেয়ে। জেলে ওকে আমার কাছে থাকতে দেবেন পুলিসসাহেব! তা'হলেই আমি সব সত্যি কথা বলব।"···

এতক্ষণে নিবারণ কথা বলল।

"কি পরিমাণ বদ দেখছেন তো হুজুর মেয়েমানুষটা। নাগরকে বাঁচিয়ে স্বামীকে জেলে পুরতে চায়।" তার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

॥ দুই অপরাধী ॥

এই যে! এসে গেল!

সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ! অদ্ভুত সময়ের জ্ঞান লোকটার! হাতে চায়ের কাপ নিয়ে, এই শব্দটারই প্রতীক্ষা করছিল অমলেশ। অথচ যেন আর একটু দেরি হলে ভাল হত। তার স্ত্রী গীতার নিখুঁত সংসারিক ব্যবস্থায় সব কাজের সময় বাঁধা; এক মিনিট এদিক ওদিক হবার জো নাই। সেই জন্য এবাড়িতে সকালের চা তয়ের হাওয়া, আর খবরের কাগজ আসা, এ দুটো জিনিসের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

বুক দুরদুর করছে অমলেশের।

"খবরের কাগজ!"

জানলা দিয়ে খবরের কাগজখান পড়ল মেঝের উপর। কালকের সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভারটিও কি ঠিক এখনই, আজকের কাগজ হাতে পেল? তারও কি কাগজখান খোলবার সময় এই রকমই হাত কাঁপছে? তারও কি অমলেশের কথা মনে পড়ল হঠাৎ? কালকের সেই অস্বস্তির মিহি জালের মিহিসুতো বেয়ে কি-একটা মনে-পড়ানির ঝিলিক সাড়া জাগাচ্ছে সেখান থেকে? নইলে ঠিক খবরের কাগজ হাতে নেবার মুহূর্তে তার কথা মনে পড়বে কেন। গীতা যদি চা করতে আজ একটু দেরি করত, তাহলে বোধহয় খবরের কাগজখান আসতেও একটু দেরি হত! কিন্তু ঘড়ি-সর্বস্ব স্ত্রীর কল্যাণে সেটি হবার উপায় নেই।···

সংসারে সব কাজ ঘড়ি ধরে হলে এক-একজন লোকের সুবিধা হয়। অমলেশ সে ধরনের লোক না। কাজের জন্য দেওয়া ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে বেজে সারা হলেও সে মটকা মেরে বিছানায় পড়ে থাকতে ভালবাসে। তাই স্ত্রীর সময়নিষ্ঠ ব্যবস্থায় তার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। এ নিয়ে নটখটি লেগেই আছে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে। গীতার সময়ানুবর্তিতার বাতিকের উপর কটাক্ষ

করে, বিয়ের বার্ষিক তিথিতে, তাকে একটা রিস্টওয়াচ উপহার দিয়েছিল অমলেশ একবার। কিন্তু বুঝলে তবে তো! ফল হয়েছিল ঠিক উলটো।

গীতা ছুটির দিনে আরও শক্ত করে রাশ টেনে রাখতে চায় স্বামীর উপর। এ নিয়ে সর্বাধুনিক মন-কষাকষি হয় পরশু রাত্রিতে। পরশু ছিল শনিবার। রাতের আড্ডাটা বেশ জমেছিল। তাই অমলেশের বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়। গল্পে গল্পে আন্দাজ পায় নি সময়ের। বাড়িতে এসে বহুক্ষণ ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি, কড়া-নাড়ানাড়ির পর গীতা নিঃশব্দে নেমে এসে দরজা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দুড়দুড় করে আবার উপরে উঠে গেল— দরজার খিলটা নিজে বন্ধ করে দেবার জন্য দাঁড়াল না পর্যন্ত। নিজের দেরির জন্য যে একটু সাফাই গাইবে, সে সুযোগ পায় নি অমলেশ। ঘরে দুজনের ভাত ঢাকা ছিল। আবহাওয়া একটু হালকা করে নেবার উদ্দেশ্যে অমলেশ বলে—"আমার আসতে দেরি দেখলে, তুমি আগে খেয়ে নিলেই পার।" কোন জবাব পেল না। উপরন্তু তার খাওয়া শেষ হবার আগেই, গীতা মশারির মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

"খেলে না গীতা?"

কোন উত্তর নাই।

মেজাজ খারাপ হয়ে যায় অমলেশের। এত রাগ দেখাবার কোন কারণ হয় নি গীতার! মদও খায় না; বাইরে রাতও কাটায় না! একটা শনিবারের রাতে আড্ডা দিয়ে ফিরতে একটু দেরি হয়েছে, তাই নিয়ে এত হুলস্থুল!······যত ভাবে তত মন খারাপ হয়; তত মাথা গরম হয়ে ওঠে। সারারাত ঘুম এল না মানসিক অশান্তিতে। গীতার নাক-ডাকানি, অমলেশের অভিমানের ব্যথা আরও দুঃসহ করে তোলে! ভোর-বেলায় গীতা যথাসময়ে উঠে চায়ের জল চড়াতে গেল; আর সে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। মনের অশান্তি ভোলবার জন্য বেরিয়ে পড়া; কোথায় যাবে আগে থেকে ঠিক করে বার হয় নি। শেষ পর্যন্ত গিয়ে বসেছিল দক্ষিণেশ্বরে।

বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাববার নামই বোধহয় মনের গ্লানি কাটানো। লোকজনের আসা-যাওয়া দেখে; কিন্তু তার মধ্যে পরিচিতির সাড় নাই। সে

শুধু তাকানো। ঘুরে ফিরে গীতার কথাই মনে পড়ে। আরও কত কথা। · এরই মধ্যে কখন থেকে যেন, গীতার দিক থেকেও রাত্রির ঘটনাটা ভাবতে আরম্ভ করেছে অমলেশ। স্ত্রী তার উপর অন্যায় করেছে, এ মতে অবিচলিত থেকেও, সে মনে মনে অপর পক্ষের উপর ন্যায় বিচার করবার চেষ্টা করে। আফিস, স্কুলের ভাত ঠিক সময়ে রেঁধে দেবার দায়িত্বের তুলনায়, দশটা-পাঁচটা আফিস করা ছেলেখেলা মাত্র—এই পক্ষপাতহীন নির্ণয়ে পৌছবার পর, হঠাৎ খেয়াল হয় যে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। রবিবারের সকালের ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। ঘড়ি সঙ্গে নাই। একবার সূর্যের দিকে, আর একবার গাছের ছায়ার দিকে তাকিয়ে, অমলেশ ধড়মড় করে উঠে পড়ে। জ্যৈষ্ঠ মাস। রুক্ষ রৌদ্রের দিকে তাকানো যায় না।······গীতা নিশ্চয়ই না খেয়ে-দেয়ে, ভাত আগলে বসে রয়েছে। ছেলেমেয়েদেরও খাওয়া হয়েছে কিনা কে জানে! হয়ত লোক পাঠিয়েছে চারিদিকে তার খোঁজে।···হয়ত থানায় খবর দিয়েছে। হয়ত ভয় পেয়ে, কত কি খারাপ ভেবে নিয়েছে!···ছি ছি! আর এক মিনিটও দেরী করা উচিত নয়!···

খুব তেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু বাড়ির লোকেরা অভুক্ত রয়েছে এই কথা ভেবে, অমলেশ ডাব কিনে খেতে গিয়েও ফিরে এল। 'বাস্'-এ গেলে ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। আই একখান ট্যাক্সি আসতে দেখে সেইদিকে এগিয়ে যায়। আরও দুজন লোক ছুটে আসছে সেইদিকে; কে আগে ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে পারে তাই নিয়ে রেষারেষি। যাক, সে-ই প্রথম কথা বলতে পেরেছে—গাড়ি ভালভাবে থামবার আগেই।

—গাড়ি কি ভাড়া করা আছে যাতায়াতের জন্য? কলকাতায় যাবে কি?

কথা না বলে, গ্রীবাভঙ্গিতে ড্রাইভার বুঝিয়ে দিল যে, সে যেতে পারে। গাড়ির আরোহিনী এখানে নেমে গেলেই সে কলকাতায় ফেরবার লোক নিতে পারে। সে হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল। আরোহিনী নামলেন গাড়ি থেকে। নেহাত দরজা খুলে দিল বলেই যেন নামলেন। বয়স আন্দাজ ছাব্বিশ-সাতাশ বছর হবে। সধবার বেশ। ফ্যাকাশে রঙ—শুকনো শুকনো চেহারা—বোধহয় উপোস করে পুজো দিতে এসেছেন। মুখখানি ভারী মিষ্টি।

অথচ দেখলেই মায়া হয়। অনেক অল্পবয়সী বিধবাদের মুখচোখে যে রকম একটা বিষাদ-করুণ ভাব থাকে, সেই রকম ভাব এঁরও চোখমুখে। তোয়ালেতে জড়ানো একটা ছোট পুঁটুলি হাতে ; তার মধ্যে থেকে একটা কাচের গ্লাসের উপর দিকটা খানিকটা দেখা যাচ্ছে।······

···একটু অন্যরকম অন্যরকম ! ···ঠিক যেন মিলল না, অন্য পূজার্থিনী-দের সঙ্গে। অপরের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো মাননিক অবস্থা নয় তখন অললেশের, তবু মনে এসে গেল কথাটা আপনা থেকে।

হাতের মুঠোর মধ্যের দোমড়ানো মোচড়ানো নোটখান ড্রাইভারের হাতে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা মন্দিরের দিকে। ড্রাইভার ডাকল—"একটু থামবেন ! এই নিয়ে যান বাকী পয়সা—তিনটাকা বারো আনা !"

···ড্রাইভারটা ভুল করল নাকি ? মিটারে যা উঠেছে তা তো নিচ্ছে না !···

ফেরত-দেওয়া টাকাপয়সাগুলো ভদ্রমহিলা হাত পেতে নিলেন। কত পাওনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন নাই ; প্রাপ্য পয়সা না নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন একথা মনে পড়ায় চমকিত লজ্জা নাই ; ফেরত পাবার পর ধন্যবাদ-জ্ঞাপক চোখের হাসিটি নাই ; কত দিয়েছিলেন সেটাও বোধহয় জানেন না। ফেরত দিতে হবে না, ওটাকা তোমাকেই দিয়েছি—একথা বলবার মতো মানসিক সক্রিয়তাটুকুও তাঁর নাই বলে বোধ হল। কোন রকন যেন সাড়া নেই !···মোহাচ্ছন্নের মতো তিনি এগিয়ে গেলেন মন্দিরের পথে—একটিও কথা না বলে।

গাড়িতে চড়ে বসে অমলেশ। এখনও মহিলাটির বসবার জায়গাটা গরম রয়েছে।

"কটা বাজল ?"

ড্রাইভার জবাব দিল না। 'ষ্টিয়ারিং হুইল'-এ হাত রেখে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে মহিলাটির দিকে। গভীর দরদে ভরা চাউনি। মহিলাটি মন্দিরের দেওয়ালের আড়ালে পড়ে গেলে, তবে সে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

"কটা বাজল ?"

"কি যে এঁদের ব্যাপার !"

"ঘড়ি আছে নাকি কাছে ? কটা হবে এখন ?"

"বুঝলাম না কিছু মশাই—কি যে এঁদের ব্যাপার!"

"এঁদের মানে?"

"এঁর আর এঁর বাড়ির লোকদের কথা বলছি।" লোকটা কথা বলে ভাল। মহিলাটির সম্বন্ধে যেটুকু জানে, বেশ গুছিয়ে বলল, না জিজ্ঞাসা করতেই। কথাগুলো বলবার একজন লোক পেয়ে যেন বেঁচে গেল।

মহিলাটি গাড়িতে উঠেছিলেন—হাসপাতাল থেকে। শ্যামবাজারের এক ঠিকানায় যেতে বলেন। সে এক প্রকাণ্ড বাড়ি মশাই। একটু পড়তিমুখো বনেদি ঘর যেমন হয় আর কি। হাবভাব দেখে বোঝা যায় তো। এঁর চেহারা তো দেখলেনই আপনি। ...ভদ্রমহিলা ট্যাক্সির ভাড়া না চুকিয়েই ঢুকলেন সদর দরজায়। একটাও কথা বলেন নি। আমি ভাবছি বাড়ির লোক কেউ এসে বুঝি পয়সা দিয়ে যাবে; হাসপাতাল থেকে হয়ত হঠাৎ ডিস্‌চার্জ করে দিয়ে থাকবে; তাই বোধহয় কাছে টাকাপয়সা নাই। ...আমি গাড়ির মধ্যে থেকে বসে-বসেই দেখছি। বাইরের একখান ঘরের মধ্য দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকতে হয়। কিন্তু ঢুকতে আর হল না ভদ্রমহিলাকে। বাইরের ঘরেই বাড়ির জনকয়েক লোক জড় হয়ে গেল।

'না না, এখানে জায়গা হবে না।'

চিৎকার করে বলা না হলেও স্পষ্ট শোনা গেল গাড়ি থেকে। দেখতে পাচ্ছি সব সেখান থেকে। যিনি বললেন, সে ভদ্রলোকের চেহারাটি বেশ—শুধু একটু মোটার দিকে—এই যা। ওই যেমন ঘিয়ে-দুধে বড়লোকের বাড়ির ছেলেরা হয় আর কি, সেই রকম।

"রানী আর খোকাকে একবার দেখতাম!"

কুণ্ঠিত মিনতিটুকু জানাবার সময় যেন ভদ্রমহিলার মাথা কাটা যাচ্ছে লজ্জায়।

"না না! আবার নতুন করে তাদের মন খারাপ করে দরকার নেই!"

শান্ত, গম্ভীর ভাবে বলা। ছোটলোকদের মতো চেঁচামেচি, কথাকাটাকাটি নেই। তবু গলার স্বরে বোঝা যায় যে এ হুকুম পালটাবার নয়। আর এ মহিলাটিও অদ্ভুত মশাই। অন্য যে-কোন মেয়েছেলে কেঁদে-কেটে অনর্থ বাধাত, চিৎকার করে পাড়ার লোক জড় করত—কত তো দেখেছি। সে

সব করবার মুখই নেই কিনা কে জানে! ভিতরের ব্যাপার তো জানি না। উনি আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আবার ট্যাক্সিতে চড়লেন। চোখে জল নেই; কেমন যেন একটা ধন্দ মতন ভাব। খানিক আগে দেখলেন না? ওই রকম। অদ্ভুত! গাড়িতে এসে বসলেন, অথচ একবার মুখ ফুটে বললেন না কোথায় যেতে হবে। আমি কি অন্তর্যামী, যে জানব? জিজ্ঞাসা করতে বললেন—বরানগর,—রাস্তা। ...সেও এক মস্ত বাড়ি। চিনতে পারবেন বোধহয়—গেটওয়ালা—লালরঙের—সম্মুখে ফুলবাগান—পাতাবাহার গাছের সারের মধ্যে দিয়ে সম্মুখের গাড়িবারান্দা পর্যন্ত রাস্তা। কাদের বাড়ি মশাই ওটা? ও, আপনার বুঝি ওদিকে যাতায়াত নেই। ...বড ঘর নইলে কি আর বড় ঘরের সঙ্গে কুটুম্বিতা, আদান-প্রদান করতে পারে। ...সম্মুখের গাড়িবারান্দার নিচে একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি যেন আশা করেন নি এঁর আসা।

"এলি কেন?"

কম কথার মানুষ ভদ্রলোকটি। গাড়িবারান্দার বাইরে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা। কেন যে এসেছেন, সে কথার জবাব দিলেন না। মিনিট দুয়েক দুজনেই চুপচাপ। বাড়ির লোকজন বোধহয় কেউ জানতে পারে নি এঁর আসবার কথা—নইলে জানলার খড়খড়ি এক-আধটাও অন্তত ফাঁক হত।

"দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

"হাসিকে একবারটি দেখতে দেবে না?"

"না।"

টলবার নয় এ হুকুম। আমি তো বাইরের লোক—আমার চেয়ে বেশি চেনেন ভদ্রমহিলা এ গলার স্বর। আবার এসে তিনি বসলেন গাড়িতে। কোন কথা নেই মুখে। বিপদ আমারই।

"এবার কোথায় যেতে হবে মা?"

আমার প্রশ্নে ঘোর-ঘোর ভাবটা বুঝি একটু কাটল। "সেই তো হচ্ছে কথা। যাকে স্বামীতে নেয় না, ভাইরা নেয় না, সে আবার যাবে কোথায়! আচ্ছা চল দেখি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে।"

তারপর তো নিজের চোখে দেখলেনই।...কি যে এঁদের ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না মশাই।...হতে পারে তো কতরকমের কত কি।...যাক, সেসব যাঁর বোঝবার তিনিই বুঝছেন!

কিন্তু কিছু বোধহয় করা উচিত ছিল! তাই না?

উত্তরের আশা না রেখে প্রশ্নটা করা। ড্রাইভারের কুণ্ঠিত মুখখানাকে দেখেই বোঝা যায় যে সে নিজেকে একটু দোষী মনে করছে।

মুহূর্তের মধ্যে এই দোষী-দোষী ভাবটা অমলেশের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। সত্যিই। কিছু বোধহয় করা উচিত ছিল! এই মহিলাটির অশান্তির তুলনায় তার পারিবারিক অশান্তি কত ছোট! কিছু বোধহয় করা উচিত ছিল! কিন্তু ভদ্রমহিলা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গাড়ি থেকে নেমে চলে যাবার সময়, এসব কথা তো সে জানত না! সে তো শুনেছে এখন। কিন্তু এখনও কি কিছু করা যায় না ইচ্ছা থাকলে?

গুমোট কাটাবার জন্য একটা কিছু বলতেই হয়।

"আচ্ছা, হাসপাতালের কোন ওয়ার্ড থেকে এসেছিলেন উনি?"

"তা কি করে বলব। আমার সঙ্গে দেখা হাসপাতালের গেটের কাছে।"

প্রশ্নটা করতে পেরে অমলেশ বাঁচে, উত্তর দেবার মতো কথা পেয়ে ড্রাইভারও বাঁচে। সমগোত্রের লোক দুজনেই। বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে তারা। বাকি পথটুকু, এই কথার জেরই টেনে নিয়ে যেতে হবে।

"মাথাটাথা খারাপ নয় তো?"

"যে কথা কটা বলেছেন, সেগুলো তো মাথা খারাপের মতো না।"

"মেটার্নিটি ওয়ার্ড নাকি?"

"কি করে বলব!"

"অন্য কোন রকম রোগ?"

"কি করে বলি!"

জানতে পারলে তবু যেন খানিকটা দায়মুক্ত হওয়া যেত। বোঝবার মতো একটা সম্ভাব্য কারণ দুজনেই খুঁজছে। ভদ্রমহিলার বর্তমান দুরদৃষ্টের দায়িত্ব, কোন রকমে কিছু পরিমাণে তাঁর উপর ফেলতে পারলে তারা বেঁচে যায়। কিন্তু সে সবের কোন সঙ্কেত রেখে যান নি তিনি। হাবভাব, কথা

চেহারা, আচরণ যেটুকু তারা দুজন দেখেছে, সব ভদ্রমহিলাটির স্বপক্ষে। সেই হয়েছে আরও মুশকিল। তাঁর অসহায় আচরণের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে যে, তোমরা যেটুকু করতে পার সেটুকু না করে পালাচ্ছ—তোমরা দোষী—দুজনেই সমান দোষী—কারও দোষ কম নয়।

অনেক সময় মাকড়সার মিহি জাল চোখে দেখা যায় না; অথচ যত সরিয়ে দিতে যাও তত মুখচোখে আরও বেশী করে লেপটে বসে; সেই রকমের একটা অস্বস্তির অদৃশ্য জাল দুজনের মনের উপর।

…"থামো! থামো! বাঁধকে! একটু এগিয়ে এসেছি। ছাড়িয়ে এসেছি। ব্যাক্ কর।…হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডান দিককার গলি।…কটা বাজল এখন?…এই যে এসে পড়েছি।"

অমলেশ পকেট থেকে একখান দশটাকার নোট বার করে ড্রাইভারকে দেয়। ভদ্রমহিলার দরুণ ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সেই আর্থিক ক্ষতিটা সে পুষিয়ে দিতে চায়—ওই টাকাটা দিয়ে নিজের চোখে নিজের দোষ কাটাতে চায়।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার হিসাব করে গুণে পয়সা ফেরত দিচ্ছে। ফিরতি পয়সার মধ্যে একখান দোমড়ানো মোচড়ানো পাঁচটাকার নোট।

"না না, দরকার নেই, পয়সা ফেরত দেবার।"

"তা কি হয়, সার!"

তার গলার স্বর দৃঢ়। আজ এর আগে দুজায়গায় যে রকম দৃঢ় গম্ভীর প্রত্যাখ্যানের স্বর শুনেছে, সেই রকম।

ধরা পড়ে গিয়েছে অমলেশ লোকটার কাছে!…কিন্তু কতটুকু কি সে করতে পারত! —ড্রাইভারের মুখের দিকে তাকাতে চায় না সে আর। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে সে বাড়ির দরজার কড়া নাড়ে।—ও এত বেলা হয়ে গিয়েছে। হাতের মুঠোর মধ্যে পাঁচটাকার নোটখান, সিঁড়িতে গীতার পায়ের শব্দ; ট্যাক্সির হর্ন গলির মোড়ে। আজকের পারিবারিক অশান্তি সরকারী সীলমোহর মেরে নিষ্পত্তি করবার জন্য সে স্ত্রীকে এখনই সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই ম্যাটিনিশো-তেই, হাতের পাঁচটাকার নোট সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খরচ করে ফেলতে চায়।

তাই আজ সকালে খবরের কাগজখান খোলবার সময় একটা মৃদু মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে সে। তাই তার মনে পড়ছে কালকের সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভারটার কথা—যার কাছে সে কাল ধরা পড়ে গিয়েছে। একটা অস্বস্তির জালের মিহি বাঁধন দুটো সমগোত্রের মনের মধ্যে। কাগজের সেই পাতাটা সে সবচেয়ে শেষে পড়বে।—আমরা কতটুকু কি করতে পারতাম!—ইচ্ছা থাকলেও আমরা কতটুকু কি করতে পারতাম! আমরা কতটুকু···জালের অদৃশ্য সুতো বেয়ে কথা ভেসে আসছে, কাগজখান খোলবার আগে মনের জোর বাড়াবার জন্য।

হ্যাঁ—আমরা। আমি নই—আমরা।

॥ পদাঙ্ক ॥

প্ল্যাটফর্মের যেখানটায় ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়িটা দাঁড়াবে সেইখান-টুকুতেই ভিড়। প্রথম লাইনে দাঁড়িয়েছেন 'সি টাইপ কোয়ার্টার'-এর বড় বড় অফিসাররা; দ্বিতীয় লাইনে 'বি টাইপ কোয়ার্টার'-এর অফিসাররা; আর তৃতীয় লাইনে আছেন 'এ টাইপ কোয়ার্টার'-এর অফিসের বাবুর দল। বুকের পাটা ঘরের আয়তন অনুযায়ী কম বেশী। লাইন সাজানোর জন্য চেষ্টা করতে হয়নি; সরকারী কলোনির সবাই নিজের নিজের স্থান জানে। উর্দিপরা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা দাঁড়িয়েছে একটু দূরে। সকলেই নীরব, কেননা 'সি টাইপ কোয়ার্টার'-এর বড়সাহেবরা পর্যন্ত এখন কথা বলছেন না নিজেদের মধ্যে। প্ল্যাটফর্মের করবীতলার খেঁকি কুকুর দুটো পর্যন্ত যেন ধ্যানে বসেছে। রেলিং-এর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সরকারী কলোনির ছেলেমেয়ের দল, তিন দলে ভাগ হয়ে। সেখানেও এই সি টাইপ, বি টাইপ, আর এ টাইপের ভাগাভাগি।

দূরে এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা গেল। হাত দিয়ে জামাকাপড় ঝেড়ে নিয়ে সকলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এসে গেল গাড়ি। 'সিভিল লিস্ট'-এর অগ্রাধিকার অনুযায়ী গুলরাজানী সাহেব প্রথম শ্রেণীর কামরার দরজা খুলতে পেলেন! নামলেন ডক্টর বোস। প্রৌঢ়, মাথা-জোড়া টাক, লম্বাচওড়া দেহ। গবাদি পশুর সংকর প্রজনন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। আমাদের এদেশী 'ব্রাহ্মণী' ষণ্ড ও বিলাতী 'এয়ারশায়ার' গাভীর বর্ণসংকরের উপর তাঁর গবেষণার খ্যাতি এখানকার গভর্নমেণ্টের কানে পৌছেছিল তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরবার আগেই। তারপর গত বাইশ বছর থেকে এখানকার এই বিরাট সরকারী গবেষণা-কেন্দ্রের সবময় কর্তা তিনি।

কিন্তু এ কী চেহারা হয়ে গিয়েছে তাঁর এই ক'দিনের মধ্যে! একেবারে মুষড়ে পড়েছেন! এত লোকজন সহকর্মীর দল কিছুই যেন নজরে পড়ছে না

তাঁর। জিনিসপত্র গাড়ি থেকে নামানো হল কিনা সেদিকে খেয়াল নাই। গেরস্ত বাড়ির সদ্যবিধবা বউও বুঝি এরকম উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখায় না। কেউ ঠিক এরকমটা আশা করেনি অমন একজন্ জাঁদরেল সাহেবের কাছ থেকে। তার উপর মেমসাহেব যে কী চিজ্ ছিলেন একখানি, সে কথা কে না জানে! তাঁরা স্টেশনে এসেছিলেন, চাকরির অঙ্গ হিসাবে, আনুষ্ঠানিকভাবে একটা কর্তব্য করতে; কিন্তু গভীর শোকের মূর্ত রূপ দেখামাত্র নিজেদের অজানতে জড়িয়ে পড়লেন তার আবর্তে। বড়দের এই অনবধানতার মুহূর্তে ছেলেপিলের দল সি টাইপ-এ টাইপের ব্যবধান ভুলে রেলিং ডিঙ্গিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। সকলেই বোস সাহেবের কাছে যেতে চায়। বউরা কিন্তু এরকম সময়েও লাইন ভাঙ্গতে পারেন না। সি টাইপ অফিসাররা 'কর্ডন' করে ঘিরে ডক্টর বোসকে নিয়ে চলেছেন মোটরগাড়িতে তুলে দেবার জন্য। দুটি অপেক্ষাকৃত বড মেয়ে সঙ্কোচে রেলিং টপকে ভিতরে ঢুকতে পারেনি। তার মধ্যে একটি মেয়ের চোখে জল। এত অভিভূত হওয়া সত্ত্বেও কি করে যেন ডক্টর বোসের নজর গেল চোখে জলভরা রেবার দিকে।

"আমার স্ত্রী ওই মেয়েটিকে খুব পছন্দ করতেন।"

স্বগতোক্তির মত শোনাল, যদিও কথাটা বলা গুলরাজানী সাহেবকে। গুলরাজানী সাহেব তাকালেন রেবার দিকে, কাজেই বি টাইপ, এ টাইপ এবং চতুর্থ শ্রেণীর সব কর্মচারীই তাকাল সেদিকে। এ টাইপের মধ্যে রেবার বাবাও ছিলেন।

'গ্রেড' অনুযায়ী দল বেঁধে, বাড়ি ফেরবার সময় সকলে সেদিন শুধু মেম-সাহেবেরই গল্প করে।......কড়া, আর বদমেজাজী হলে কি হয়, মানুষটি ছিলেন ভাল। বোস সাহেবের মত জাঁদরেল স্বামীকে শাসনে রাখতে গেলে ঐ রকম কড়া টাইপের মেমসাহেবেরই দরকার। এক একদিন স্বামীকে জুতো দিয়েও পেটাতেন; ইংরেজের মেয়ে তো! তবে হ্যাঁ, স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া কোন বাড়িতে না হয়! মনটা ভাল ছিল তাঁর; এই অগ্নিমূর্তি—এখনই আবার জল! খানসামাকে একবার চায়ের কাপ ছুঁড়ে মেরে তারপর দশ টাকা বকশিশ দিয়েছিলেন! আর চেহারা ছিল কী! লম্বায় চওড়ায় বোসসাহেবেরই সমান। দুজনেরই পালোয়ানের মত চেহারা! যে

ওঁকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারবে তাকেই উনি বিয়ে করবেন, বোধহয় এই রকমই ছিল মেম সাহেবের পণ কুমারী অবস্থায় !……

সেদিনকার শোকজ্ঞাপনের পর্ব তো এই ভাবে মিটলো। রেবার কিন্তু খুব খারাপ লাগছিল, অমন দিনে মেমসাহেবকে নিয়ে বড়দের মধ্যে ওইসব সস্তা হাসিঠাট্টা।

জীবনে মাত্র দু'দিন সে মেমসাহেবের কাছে যেতে পেয়েছিল। খুব ভাল লেগেছিল তার ভদ্রমহিলাকে।

লোকে যে যা খুশি বলুক তাঁর সম্বন্ধে।

মেয়ে স্কুলের 'স্পোর্টস্'-এর দিন এই লম্বা স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি প্রথম মিসিজ বোসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাইজ দেবার সময় রেবাকে একটু আদর করে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—"আমাদের বাড়িতে একবার যেও।"

রেবা ছাড়া আর সব মেয়েই অবাঙালী। তারা বলল, স্বামী বাঙ্গালী কিনা, তাই মেমসাহেব রেবা মিত্রকে বাড়ীতে যেতে বলেছেন। মিসিজ বোসের আচরণ সত্যিই অপ্রত্যাশিত। কেননা তিনি কোনদিন এখানকার বড় অফিসারদের স্ত্রীদের সঙ্গে পর্যন্ত মেলামেশা করেননি। এখান থেকে সতর মাইল দূরের ইউরোপীয় ক্লাবে তিনি যেতেন প্রত্যহ।

একে সি টাইপ কোয়ার্টারের ভয়, তার উপর মেমসাহেবের সঙ্গে কথা বলবার ভয়। রেবা কখনই যেত না; কিন্তু মা-বাবার মত হ'ল যে, যখন বলেছেন তখন যাওয়াই উচিত; না গেলে দেখায় খারাপ। কাজেই বাবার চাকরির খাতিরে রেবাকে যেতেই হল, বড়সাহেবের কুঠিতে। সেই হল দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ মিসিজ বোসের সঙ্গে। সি টাইপ কোয়ার্টারের বাথরুমের বৈশিষ্ট্যই ছোটবেলা থেকে তাদের কৌতূহলের খোরাক যোগাত; কিন্তু বসবার ঘরের জিনিসপত্রের ধরন যে এরকম হতে পারে, সে কথা সে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি এর আগে। তার ভয় করছে দেখে মেমসাহেব তাঁর কুকুরটাকে চেন দিয়ে বাঁধলেন। তারপর রেবাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। খৃষ্টানী এঁটো কপালে লেগে থাকায় তার গা ঘিন ঘিন করে। মেমসাহেব কত কি জিজ্ঞাসা করলেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে, তারপর এল সেই প্রত্যাশিত

ফাঁড়া। তিনি কেক খেতে দিলেন। রেবা খেলো না। তিনি চটে উঠে বললেন--"হামি মেহটর না আছি।"

রেবা ভয়ে ভয়ে বলে—"খেলে মা বকবেন।"

রঙিন ছাতাটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন—"চল তোমার মার কাছে।"

ভয়ে তার বুক দুরদুর করে। কী আবার করে বসবেন মেমসাহেব কে জানে! গটগট্ করে জোরে জোরে পা ফেলে তিনি হাঁটছেন; রেবাকে ছুটতে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে। হুলস্থুল পড়ে গেল এ টাইপ কলোনিতে। রেবার মা বাড়ির দরজা খুলে দিতেই মেমসাহেব বললেন যে, ভিতরে ঢুকে তিনি তাঁদের ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করতে চান না; শুধু জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন যে, রেবাকে যদি তিনি কোন জিনিস উপহার দেন তা হলেও কি তাঁর জাত যাবে? হ্যাঁ কি না তাই তিনি শুনতে চান, বেশী কথা খরচ করবার দরকার নাই।

রেবার মা বললেন—"না।"

"আর যদি আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যায় তা হলে?"

"জাত যাবে না।"

"মেয়ে ফিরে এলে একটু গঙ্গাপানি দিয়ে দেবেন গায়ে।"

গটগট্ করে মেমসাহেব চলে গেলেন বিদায়সম্ভাষণ করে।

এ হেন দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর মিসিজ বোসের কাছে আর কোনদিন যাওয়া হয়নি রেবার। ডাকতে এলে হয়ত যেত, কিন্তু গত দু বছরের মধ্যে তিনি ডেকে পাঠাননি।

দিন পনের আগে মেমসাহেব হঠাৎ বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বোম্বাইয়ে, একটা কঠিন অপারেশনের জন্য। সেখান থেকেই আজ বোসসাহেব ফিরলেন—একা।

স্টেশনে রেবার চোখে জল এসেছিল মিসিজ বোসের ভালবাসার কথা মনে পড়ায়।

পরের দিন সকালে আবার এক অভাবনীয় ঘটনা। সি টাইপ কম্পাউণ্ডের বেড়ার ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে রঙবেরঙের উড়্নি সালোয়ার শাড়ীর উঁকিঝুঁকি দেখতে পাওয়া গেল। বি টাইপ কোয়ার্টারের বন্ধ

জানলা দরজার খড়খড়ি ফাঁক হল। এ টাইপ কোয়ার্টারের ছেলেপিলের দল ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল। এ টাইপ পাড়ায় ডক্টর বোস! হেঁটে!

বোসসাহেব গিয়ে দাঁড়ালেন রেবাদের বাড়ির দোরগোড়ায়। রেবার মা ভয়ে অস্থির। বললেন—"রেবা, বলো উনি বাড়ি নেই।"

বাইরে থেকেই বোসসাহেব বললেন—"আমি তাঁর কাছে আসিনি, আমি রেবার কাছেই এসেছি।"

হাতের কাগজের মোড়কটা তিনি রেবার হাতে দিলেন।

"এটা আমার স্ত্রী নিজ হাতে বুনেছিলেন তোমাকে দেবার জন্য। বছর দেড়েক আগে এই স্কার্ফ টা বোনা। প্রথমে একটা সোয়েটার বুনতে আরম্ভ করেছিলেন। পরে সেটাকে ফেলে স্কার্ফে হাত দেন। বলেছিলেন যে, এখন ওর বাড়ের সময়, সোয়েটার মাস কয়েকের মধ্যেই ছোট হয়ে যাবে। তুমি তো আমাদের বাড়ি আর গেলে না; অসুস্থ হবার পরও মিসিজ বোস সে কথা বলেছিলেন।"

গলা ধরে এল বোসসাহেবের এ কথা বলতে বলতে। বাড়ের সময়ের কথাটা শুনে একটু লজ্জা লজ্জা করে রেবার। বড়সাহেব চলে যাবার পর তার আড়ষ্টতা কাটে।

সবাই এ ঘটনাটাকে নিল ডক্টর বোসের শোকের গভীরতার একটা মাপকাঠি হিসাবে। স্ত্রীকে যে ভদ্রলোক এত ভালবাসতেন সে কথা সহকর্মীরা কেউ আগে আন্দাজ করতে পারেনি। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি দেখে সকলে ভাবত তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের নয়; বিলাতে পড়বার সময় ঝোঁকের মাথায় মেম বিয়ে করে পরে বাইশ বছর ধরে তার ঠেলা সামলাতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ, স্ত্রী মারা গিয়ে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। কিন্তু সকলের হিসাব গুলিয়ে দিলেন বিপত্নীক বোসসাহেব।

একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। ছিলেন গরীব গেরস্থ বাড়ির ছেলে। পড়াশোনায় ভাল ছিলেন বলে বিলাত যাবার সুযোগ পান। মেম বিয়ে করবার জন্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ঘুচে যায়। যার জন্য আত্মীয় পরিজন সব ছেড়েছিলেন, সে এমন হঠাৎ চলে গেল! এর জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই বড় একলা একলা লাগে।

ভাবেন কাজে ডুবে থাকবেন ; কিন্তু মন বসে না। সময় কাটাবার জন্ত বিকাল বেলায় ক্লাবে গেলেন দিনকয়েক। সেখানেও লোকজনের সঙ্গ ভাল লাগে না ; মদ খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। চেষ্টা করে আলস্য কাটিয়ে ক্লাবে যাবার উদ্যম সঞ্চয় করাও কঠিন। মনে হতে আরম্ভ হয় যে বাড়িতে বসে মদ খাওয়াতেই শান্তি বেশী। ক্রমে অফিস যাওয়াও ছেড়ে দিলেন। বাড়িতে বসেই অফিসের কাগজপত্র দস্তখত করে দেন। কাজের মধ্যে সারাদিন শুধু মদ খাওয়া, আর মেমসাহেব যে রেকর্ডগুলো ভালবাসত সেইগুলোকে বাজানো। সহকর্মীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে বড়সাহেবের যদি একটি ছেলে কিংবা মেয়ে থাকত, তা হলে উনি এরকম হয়ে যেতেন না কখনই। তাঁর আজকালকার দৈনন্দিন জীবনের সব খুঁটিনাটি তারা সংগ্রহ করে খা৹সামা, বাবুর্চির কাছ থেকে। এদেরই মারফত কলোনির সকলে খবর পায় যে, সাহেবের কড়া হুকুম মেমসাহেবের জামা, জুতো, টুপি জিনিসপত্র ঘরে ঠিক আগে যেখানে ছিল, সেখান থেকে যেন একটুও নড়চড় করা না হয়। দেখলে পরে মনে হয় যেন মেমসাহেব বেড়াতে বেরিয়েছে, এখনই ফিরবে। আর একটা খবর যে, মেমসাহেবের আদরের কুকুর ট্রিক্‌সিকে সাহেব আজকাল নিজে হাতে দু বেলা খেতে দেয়। মেমসাহেবের কুকুর হলে কি হয় ওটা সাহেবকেও চিরকাল খুব ভালবাসে। মেমসাহেবকে সাহেবের উপর জুলুম করতে দেখলেই ওটা দু'জনার মধ্যে পড়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ডেকে হইচই বাধিয়ে দিত।

এটুকু বলবার পর বড়সাহেবের বেয়ারারা কোন গল্পটা করবে তা এ টাইপ বি টাইপ কলোনির সবার জানা। বহুবার শোনা কিনা। হোলি আর দেওয়ালির বকশিশ নিতে এসে ছেলেমেয়েদের পীড়াপীড়িতে প্রতি বছর তারা গলার স্বর নামিয়ে সেই পুরনো মজার খবরটা বলে।······বড়সাহেব যে দিনই খুব বেশী মাত্রায় খেয়ে নেশায় চুর হয়ে ঘুমুত, সেদিনই হত কাণ্ড বাড়িতে। মদ খাওয়ার জন্য কিছু নয়, সে তো মেমসাহেব নিজেও মদ খেতো। কোন সায়েব মেম না খায়। নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমুলে বড়সাহেবের নাক মুখ দিয়ে ফর্‌-র্‌ র্‌ ফর্‌-র্‌-র্‌ করে একটা অদ্ভুত শব্দ বার হয়। মেমসাহেব বলত যে,

ঘোড়ারা ঘাস খাওয়ার সময় নাকি মধ্যে মধ্যে ওইরকম শব্দ করে। অর্ধেক রাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে কানের কাছে ওই শব্দটা শুনলেই তার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠত। ঘোড়ার আবার বিছানায় শোবার দরকার কি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুলেই তো পারে! ধাক্কা দিয়ে সায়েবকে খাট থেকে মেঝের উপর ফেলে দিত। ট্রিকসি চিরকাল শোয় ঠিক দরজার বাইরে। মেঝেতে পড়ার শব্দটা শোনা, আর আরম্ভ হত তার চীৎকার আর দোর আঁচড়ানি। যতক্ষণ ঘরের দরজা না খুলছ, ততক্ষণ নিস্তার নাই! শেষকালে মেমসাহেব বেরুত চাবুক নিয়ে। সেসব কথা মনে করলে হাসিও পায়, আবার সায়েবের উপর মায়াও হয়! সে সময় মারলেও কি কুকুরটা থামে! শেষ পর্যন্ত সেটাকে শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিত মেমসায়েব। তখন কুঠি ঠাণ্ডা।…

পুরনো হওয়ায় এইসব গল্পের স্বাদ যখন পানসে হয়ে এসেছে, তখন সায়েবের খানসামার কাছ থেকে পাওয়া গেল এক অতি চাঞ্চল্যকর খবর। প্রত্যহ রাতদুপুরে ট্রিক্সি ডেকে ডেকে বাড়ি মাথায় করছে। ডাকে আর দোর আঁচড়ায়। সাহেব উঠে দরজা খুলে তাকে ভিতরে নিয়ে যান। পর পর ক'দিন সায়েবের ঘুমের ব্যাঘাত হতে দেখে বেয়ারা সাহসে বুক বেঁধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, কুকুরটাকে রাত্রিতে বাড়ির বাইরে বেঁধে রাখবে কিনা। সায়েব কোন কথা না বলে কটমট করে শুধু একবার তাকিয়েছিলেন তার দিকে। তারপর তিন দিন তিনি ঘর থেকে বার হননি; খানসামা বাবুর্চির সঙ্গে কোন কথাও বলেননি। চতুর্থ দিন সকাল বেলা দেখা গেল সাহেব নিজে ঘরের জিনিসপত্র গোছগাছ করলেন। বেয়ারারা তো অপ্রস্তুতের একশেষ। কোথাও যাবেন নাকি? কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে, সায়েবের হাত থেকে কাজ কেড়ে নিতে গেল। তিনি বাধা দিলেন না। মেমসায়েবের জিনিসপত্র-গুলোকে দেখিয়ে সেগুলোকে আলমারির মধ্যে তুলে রাখতে বললেন। গলার স্বরে সাহেবী হুকুমের সে ঝাঁজ নেই। এতকাল ও জিনিসগুলোতে কাউকে হাত দিতে দিতেন না। ব্যাপার কী! কাল সারা রাত মদ চলেছিল, তারই জের সকালেও রয়েছে নাকি? জামা, জুতো, টুপি থেকে আরম্ভ করে ছাতা, পাউডারের কৌটো, ভ্যানিটি ব্যাগ পর্যন্ত সব জিনিস ভরা হল তিনটে আলমারিতে। তারপর সাহেব বললেন, আজ থেকে অন্য ঘরে যেন

তাঁর শোবার বিছানা পাতা হয়। অবাক হয়ে গেল বেয়ারা। এ আবার কী নতুন খেয়াল সায়েবের! বাবুর্চিখানায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেও তারা এর কোন কারণ খুঁজে পেল না। টেবিলের উপর মেমসাহেবের যে ফোটোগ্রাফখানা ছিল সেখানাকে কাগজে মুড়ে নিয়ে সায়েব বেরুলেন বাড়ি থেকে আজ অনেকদিনের পর। সোজা গেলেন এ টাইপ কলোনিতে। রেবার হাতে ফোটোগ্রাফখানা দিয়ে বললেন—"আমার স্ত্রী তোমায় খুব ভালবাসতেন; তাই এটা তোমায় দিচ্ছি।" তিনি চলে যাওয়া মাত্র প্রতিবেশিনীরা ছুটে এলেন মেমসাহেবের ফোটোগ্রাফ দেখতে। মাতালকে তাঁরা ভয় করেন ঠিকই; তবু তাঁদের মন এই বিগতদার মানুষটির প্রতি সহানুভূতিতে ভরা।

"কী চেহারা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন!"

"খাওয়াদাওয়া তো প্রায় নাই বললেই হয়; খালি মদে কি শরীর টেকে!"

"বউ নিয়ে ঘর করা যাদের একবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, বিয়ে না করলে তারা অবধারিত পাগল হয়ে যায়।"

"সেই রকমই লক্ষণ।"

"ছুটি নিয়ে বিলাত গিয়ে আর একটা মেম ধরে আনলেই তো পারে।"

রেবার মা সায় দিলেন—"পঞ্চাশ বছর বয়সে সাহেবদের মধ্যে কত লোক প্রথমবার বিয়ে করে।"

"ইনিও করবেন; সবুর কর না কিছুদিন।"

এই হল অন্তিম রায় এ টাইপ কলোনির মেয়েমহলের।

আর ওদিকে সাহেবের কুঠিতে, বেয়ারা বাবুর্চিরা সারা দিন মাথা ঘামিয়েও আসল ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। বুঝল শেষ রাত্রিতে। ট্রিকসির ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল বেয়ারার। কিন্তু কুকুরটা আজকাল প্রত্যহ ওই রকম করে ডাকে বলে সে আর বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। হঠাৎ দরজার বাইরে জুতোর শব্দ শুনে উঠতে হল। সাহেব নিজে এসেছেন 'আউট হাউস'-এ তাকে ডাকতে। ট্রিক্সিও সঙ্গে আছে। হাঁফাচ্ছেন তিনি। সাহেব বেয়ারাকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের শোবার ঘরে, তারপর বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসলেন গদিওয়ালা চেয়ারটায়। অনেকক্ষণ দুইজনেই চুপচাপ। ট্রিক্সি খাটের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কি যেন শুঁকছে। ভোর হবার পর

সাহেব জানালেন তাঁর বিপদের কথা। মেমসাহেব তাঁকে প্রত্যহ খাট থেকে নীচে মেঝের উপর ফেলে দিচ্ছে, তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায়।

তারপর ডাকা হল রসুলপুরের নামজাদা রুস্তম ওঝাকে। তার কথা অনুযায়ী জিনিসপত্র কেনা হল। সেগুলোকে রাখা হল সাজিয়ে, একটা প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়িতে। শনিবারের দিন ঠিক দুপুর বেলা রুস্তম ওঝা বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে একখানা চারকোনা রেশমী চাদর দিয়ে হাঁড়িটাকে ঢেকে দিল। ভরা দুপুরে সেটাকে মাথায় করে বোসসাহেব রেখে এলেন তেরাস্তার উপর—ঠিক যেখান থেকে এ টাইপ কলেনির রাস্তাটা বেরিয়েছে সেই মোড়ে।

এ নিয়ে টিটিক্কার পড়ে গেল সারা কলেনিতে। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি লোকটার একেবারে? কয়েকদিন এ ছাড়া আর অন্য কোন কথা নেই এখানকার লোকের মুখে। পুরুষরা নাক সিঁটকল অত বড় একজন বৈজ্ঞানিককে এমন নিকৃষ্ট শ্রেণীর কুসংস্কারের আওতায় পড়তে দেখে। রেবার মা মেয়েকে বারণ করে দিলেন যেন পথের মোড়ের সেই জায়গাটা দিয়ে ভুলেও না হাঁটে। রাস্তার ঝাড়ুদার পর্যন্ত সেই জায়গাটুকু ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করে দিল।

আর এদিকে তেমাথার উপর হাঁড়িটা রেখে বোসসাহেব বাড়িতে এসে বসলেন বোতল আর গ্লাস নিয়ে। দুপুর থেকে আরম্ভ করে রাত বারোটা পর্যন্ত চালিয়ে গেলেন একনাগাড়ে। নেশায় বুঁদ না হয়ে পড়া পর্যন্ত ছাড়বেন না এই সংকল্প। নইলে ওঝার ওষুধের পরীক্ষা হবে না। খানসামা, বাবুর্চি, রুস্তম ওঝা, সবাই সারা রাত জেগে, কান খাড়া করে। সকাল সাড়ে আটটার সময় ঘুম ভেঙ্গে উঠে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন বোসসাহেব। ওষুধে ফল ধরেছে! যাবার আগে রুস্তম ওঝা কম্পাউণ্ডের চতুঃসীমার উপর কি কি যেন ছিটিয়ে মন্ত্র পড়ে দিল। বলে গেল; শরাবের উপরই মেমসাহেবের রাগ, আর বোধ হয় সাহেবকে বলছেন আবার বিয়ে করতে।

সাহেব বাবুর্চিকে বলে দিলেন ভাতে জল দিয়ে রাখতে। রাত্রিতে আজ তিনি শুধু পান্তা ভাত খাবেন লেবুর রস দিয়ে। অনেককাল পর আজ অফিস গেলেন।

সন্ধ্যাবেলাটায় মদের লোভ সামলানো শক্ত। সন্ধ্যা থেকে রাত্রিতে ভাত খাওয়ার সময়টুকু কোনরকমে মদ না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারলে হ'ল। তারপর খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়া। এ না করলে ওঝার মন্ত্রের ধক নষ্ট হয়ে যাবে। ক্লাবে গেলে পান না করে ফেরা অসম্ভব! সিনেমা প্রত্যহ দেখা চলে না। কফি, চুরুটের মাত্রা বাড়িয়ে দেখলেন; দেশবিদেশের মদ্যপান নিবারণী সভায় চিঠি লিখলেন উপদেশের জন্য; করে দেখলেন আরও অনেক রকমের বৈকল্পিক নেশা। পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে বুঝলেন, এ টাইপ কোয়ার্টারে রেবাদের বাড়ি সন্ধ্যাবেলায় যাওয়াটাই সব রকম নেশার মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী।

গৃহস্থালির শত জিনিসে ভরা এ-টাইপ কোয়ার্টারের ছোট ঘর। মোড়ার উপর তাঁর খাতিরে 'আসুন বসুন' লেখা আসন পাতা। দেওয়ালে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ছবি। তিনিও ছোটবেলায় এই পরিবেশেই মানুষ। সন্ধ্যাবেলা ঘরের মধ্যের ধুনোর গন্ধটা আরও বেশী করে সেই সব ছেলেবেলার কথা মনে পড়ায়। এ-ঘরে ঢুকলেই বেশ বাড়ি বাড়ি মনে হয়। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডওয়ালা সি-টাইপ বাড়িগুলো, তাঁদের ছেলেবেলার ধারণা অনুযায়ী স্কুল, অফিস, কাছারির মত লাগে দেখতে। সি-টাইপ বাড়িতে তাঁদের থাকবার ধরনেও এঁদের তুলনায় একটু যেন হোটেল-হোটেল ভাব। খুব ভাল লাগে রেবাদের এই ঘরখানা। রেবার বাবা প্রথম থেকে বড়-সাহেবের সঙ্গে মাখামাখি করবার বিরুদ্ধে; কিন্তু অত বড় একজন লোককে নিষেধ করতে সাহস পান না। তারপর বড়সাহেব রেবার মার হাতের সুক্তানি খেতে চাইলেন; মোচার ঘণ্ট খেতে চাইলেন; কেমন করে সুক্তানি রাঁধতে হয়, সেটা রেবাকে একখানা কাগজে লিখে দিতে বললেন, বাবুর্চিকে শেখাবার জন্য। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে তখন আর তাঁকে এ-বাড়িতে আসতে বারণ করা চলে না।

এখানকার সরকারী কলোনীতে সি-টাইপ পরিবারের সঙ্গে এ-টাইপ পরিবারের ঘনিষ্ঠতা এর আগে পর্যন্ত কখনও হতে দেখা যায়নি। রীতিবিরুদ্ধ বলেই এই মাখামাখি প্রথম থেকে দৃষ্টিকটু লাগছিল সকলের চোখে। প্রত্যেকে নিজের নিজের ধরনে এর ব্যাখ্যা করে। নানারকম কানাঘুষা আরম্ভ হয়। উপরে বেনামী চিঠি যায়। ফলে গোপন তদন্ত করবার

জন্য উপর থেকে লোক পাঠানো হয়। তখন বোসসাহেব রেবার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব তোলেন। রেবার মা বললেন, পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে তিনি কিছুতেই ষোল বছরের মেয়ের বিয়ে দেবেন না। বোসসাহেব বললেন, তাঁর বয়স কখনই পঞ্চাশ নয়—তাঁর বয়স আটচল্লিশ বছর সাত মাস। রেবার বাবা সায় দিলেন। বোসসাহেব অনুরোধ করলেন—এ বিষয়ে রেবার মতামত জানতে। রেবার মা আরও চটলেন—"অতটুকু মেয়ের আবার মতামত কি?" রেবার বাবা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে জানাল যে, সে বোসসাহেবকে বিয়ে করবে।

মা রাগারাগি করলেন ; গালাগাল দিলেন।

"উনি যে তোর বাপের বয়সী!"

মেয়ে চুপ করে থাকল ; কিন্তু মত বদলাল না।

বাবা বললেন—"রেবার গড়ন বেশ বাড়-বাড়ন্ত।"

অফিসারদের ক্লাবে সবাই হাসাহাসি করল Beefy Cowদের উপর ডক্টর বোসের মজ্জাগত পক্ষপাত নিয়ে।

এই সময় এখান থেকে বদলির খবর এল বোসসাহেবের। এতদিনকার কাজে ঢিলেমির ফলে তাঁর চাকরিতে দুর্নাম হয়েছে। তাই তাঁকে পাঠাচ্ছে এক ভেটারিনারি কলেজের অধ্যক্ষ করে। বোসসাহেবের পক্ষে এ হ'ল শাপে বর। শ্বশুর তাঁর অধীনে এখানকার অফিসে চাকরী করতেন, জিনিসটা দেখাত বড়ই খারাপ। বিয়ে করে বউ নিয়ে তিনি চলে গেলেন নতুন কর্মস্থলে। সঙ্গে নিলেন পুরনো খানসামাকে।

মাথাজোড়া টাক হলেও বোসসাহেবকে দেখতে রেবার খারাপ লাগে না। বিবাহিত জীবনে অর্থ-সাচ্ছল্য কে না চায়! এত বড একজন সাহেবের সঙ্গে বিয়ে হবার সৌভাগ্যে সে পরম তৃপ্ত; একজন ইংরেজ মেমের জায়গা নিচ্ছে বলে একটু গর্বিতাও। ছোটবেলা থেকে সি-টাইপ কোয়ার্টারগুলোকে সে বেশ ভীতমিশ্রিত সম্ভ্রমের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। যে লোকটা এতকাল একজন মেম নিয়ে ঘর করে এসেছে, তার বাড়ির গৃহিণীপনা হাতে তুলে নিতে ভয়-ভয় করে। যদি অখাদ্য কুখাদ্য খেতে বলে! কার্পেট, সোফা, বাথরুম, খাওয়ার টেবিল, আল্‌সেসিয়ান কুকুর, রাতের পোশাক, সব জিনিসের

নামগুলোর সঙ্গে ঠিক আতঙ্ক না হলেও গভীর উদ্বেগ জড়ানো। পারবে তো সে শেষ পর্যন্ত? অত বড় একটা মানুষ! যতই ভাল লাগুক, তাঁকে ভয় আর সমীহ না করে উপায় নাই।

রেবার মনের এই দিকটার উপর বোস-সাহেবেরও খেয়াল আছে। তার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি সজাগ। বয়স বেশী হবার জন্য রেবার কাছে তার একটু কুণ্ঠা আছে। তার উপর,স্ত্রীর মন যুগিয়ে চলবার বিলাতী কায়দায় তিনি অভ্যস্ত। বয়সের ব্যবধানটা থাকবেই; স্ত্রীর মন ধরে রাখতে হবে শুধু বুঝে-সুঝে চলে। বুঝে-সুঝে চলতে গিয়ে তিনি একটু বাড়াবাড়িই করে ফেললেন। বিয়ের আগেকার পরিচয়ে রেবার পছন্দ-অপছন্দ সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছিলেন, নিজের পছন্দ-অপছন্দও সেই অনুযায়ী খানিকটা কাটছাঁট করে নেবার চেষ্টা করলেন। রেবা যে ধরনের জীবনে এতকাল অভ্যস্ত, সেইটা যাতে তাঁর নিজেরও ভাল লাগে তার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'কিনলেন; রেবাকে শুনিয়ে দিলেন যে, মেঝেতে পিঁড়ি পেতে বসে কাঁসার থালায় ভাত খেতে তাঁর খুব ভাল লাগে। একটি অল্পবয়সী মেয়ের মনের মতন হবার চেষ্টার মধ্যে বেশ খানিকটা উদ্দীপনা আছে। তার মনের অন্ধিসন্ধিগুলোর মধ্যে প্রবেশ করবার কৌতূহল সর্বদা জাগ্রত রাখতে হয়। রেবার কথাবার্তা, হাবভাবের প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটির উপর তিনি লক্ষ্য রাখেন; আব ইচ্ছা না থাকলে স্বর্গগতা এমিলির আচরণের সঙ্গে সেগুলোর তুলনা না করে পারেন না। অনেক কথা আছে, যা মেমসাহেবকে বলা চলত, অথচ একে বলা চলে না। মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে মনে হয় রেবাই ভাল। তার বালিশে কেমন নারকোল তেলের গন্ধ; হঠাৎ লজ্জা পেলে সে কেমন সুন্দর করে জিব কাটে; আরও কত কি আছে। রেবার ছেলেমানুষি ভাবটা তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগে। তাঁর যদি বিশ-বাইশ বছর বয়সে বিয়ে হত একটি ঘোমটা-পরা টুকটুকে বউয়ের সঙ্গে তা হলে সে যেমন ব্যবহার করত বরের কাছে এলে, তারই স্বাদ পাবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর। সেই রকম করে পিছন থেকে চুপি চুপি এসে তাঁর চোখ চেপে ধরুক; নাকের ডগায় এলো চুলের সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে খিলখিল করে হাসুক;

শীতের রাতে ঠাণ্ডা আঙুলগুলো ঘাড়ের পিছনে ঠেকিয়ে পালিয়ে যাক; কিন্তু রেবা সেসব করে কই!

আর রেবা! অত বড় একজন হোমরাচোমরা সাহেবকে 'তুমি' বলতে তার বাধো-বাধো ঠেকে। স্বর্গগতা মেমসাহেবের সংসার দেখাশোনা করবার ভার সে পেয়েছে, তার অযোগ্যতা সত্ত্বেও। সব সময় সে তটস্থ—এই বুঝি কিছু ত্রুটি হয়ে গেল তার। প্রতিটি কাজ করবার আগে তাকে একবার ভেবে নিতে হয়। স্বামীর দুটো দাঁত বাঁধানো। মধ্যে মধ্যে বাঁধানো দাঁত ওষুধে ভিজিয়ে রেখে পরে বুরুশ দিয়ে পরিষ্কার করেন বোসসাহেব বাথরুমে। রেবা চায় এ-কাজটা করে দিতে, কিন্তু পারে না। স্বামী যদি কিছু মনে করেন! বয়সের ব্যবধানজনিত এই রকমের সঙ্কোচকাতরতার বাধা তার পদে পদে। কিন্তু এর চেয়েও বড় আর এক রকমের বাধা তার মনের সম্মুখে খাড়া আছে অষ্টপ্রহর। মুখ্য সেটা 'সি-টাইপ-এ-টাইপ'-এর ব্যবধানজনিত। বিয়ের পর থেকে আইনের চোখে সে নিজেকে 'সি-টাইপ বলে দাবি করতে পারে বটে; কিন্তু সে কিছুতেই নিজের হীনতার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারে না। বাইরের লোকের কাছে সি-টাইপ কোয়ার্টারসুলভ ভাব প্রয়োজনের চেয়েও উগ্রভাবে প্রকাশ করে ফেলে; কিন্তু স্বামীর সম্মুখে গেলেই কেন যেন অন্য রকমের হয়ে যায়। সে ভাবে যে, তার স্বামী ঠিক সি-টাইপ কোয়ার্টারের অন্য অফিসারদের মত ন'ন। তিনি যে বাইশ বছর ইংরেজ মেমসাহেবের সঙ্গে ঘর করেছেন। সেইটাই তাঁর সত্যিকারের পছন্দ। মেঝেতে বসে খাওয়া, 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়া ইত্যাদি কাজগুলো যে জোর করে করা, সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি তার আছে। উনি এমিলি-মেমকে কী ভালবাসতেন জানে তো সে। স্বচক্ষে দেখেছে তো মেমসাহেব মারা যাবার পর তাঁর অবস্থাটা। বিয়ে হলে পর, তার বয়সী অন্য মেয়েরা পায় বর, সে পেয়েছে স্বামী। স্বামীর মনের মতো হওয়ার মানে সেই মেমসাহেবের মতন হওয়া সে তো মেমসাহেব নয়, পারবে কেমন করে? সে রকম গায়ের রঙও কোনদিন হবে না, সে রকম ইংরেজী বলতেও পারবে না কোনদিন; সে রকম টুপি, গাউনও সে কোনদিন পরবে না মরে গেলেও। কিন্তু তিনি যেমন করে সংসার চালাতেন স্বামীর দেখাশোনা করতেন. তা কেন নকল করতে পারবে

না! চেষ্টা করলেই পারবে। দরকার শুধু সেই সব ছোট-ছোট খবরগুলো জানবার। বলতে পারেন একমাত্র স্বামী কিন্তু যা চাপা মানুষ উনি, ওসব কথার ধার দিয়েও যান না। মেমের কথা জিজ্ঞাসা করতেও বাধো-বাধো লাগে তাঁর কাছে। রেবা স্বামীর হাবভাব দেখে তাঁর পছন্দ-অপছন্দ বোঝবার চেষ্টা করে। পুরনো বেয়ারাকে যখন তখন খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করেও সে অনেক কথা জেনে নেয়। স্বামীর চোখমুখের উপর লক্ষ্য রাখতে গিয়ে অনেক সময় সে ধরা পড়ে গিয়েছে; কিন্তু তিনিও যেন ধরা পড়ে গেলেন, মুখের ভাব হয়ে যায় তাঁর তখন। কী ভাবেন, তিনিই জানেন। বেয়ারার সঙ্গে একদিন পুরনো মেমসাহেবের গল্প করছে হঠাৎ মনে হ'ল স্বামী তাদের কথা শোনবার জন্য দরজার পাশের চেয়ারখানায় এসে বসলেন। কেন কে জানে!

বোসসাহেব ব্যথা পান, রেবা বেয়ারার সঙ্গে পর্যন্ত সহজভাবে কথা বলে, অথচ তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সময় অন্য রকম হয়ে যায়। কেন তাঁর সম্মুখে এলেই একটু আড়ষ্ট ভাব দেখতে পান তার মধ্যে? কেন রেবাকে কিছু বলতে গেলেই তাঁর মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ে? নিজের অধিকার বুঝে নিতে কেন তার কুণ্ঠা? কেন সে তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করে না? খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেও সে কোন বিষয়ে নিজের মতামত দেয় না। রেবা তাঁর কথা শোনে ঠিক; কিন্তু যার মন চাও, তার কাছ থেকে শুধু বাধ্যতা আর বশ্যতা পাওয়া, কতটুকুনি পাওয়া? কেন তার সঙ্কোচ-ভীরুতা? আচরণে কোন ত্রুটি নেই, অথচ কি একটা জিনিসের যেন অভাব তার মধ্যে। হাতের বন্ধনের মধ্যেও তার দেহ আড়ষ্ট। দুর্বোধ্য তার মনের এই জটিলতা। যে একেবারে আপন, সে যদি সব সময় একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলে, তা হলে ব্যথা পাবারই কথা। আগের মেমসাহেব এমিলিকে তিনি বুঝতেন; সে যা বলত, পরিষ্কার খোলাখুলি বলত। কর্তব্যে ত্রুটি তার বেশী হ'ত রেবার চেয়ে; সেবা হয়ত এমন নিখুঁত ছিল না; কিন্তু কোন দোষ করবার পরও স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াতে একদিনের জন্যও সে এরকম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেনি। অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে মাইনে-পাওয়া ঝি-চাকরে। বিবাহিতা স্ত্রী কেন করবে? এমিলি কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতেও জানত; আবার নিজেকে নিঃশেষ করে দিতেও জানত। রেবা তা পারছে না। পারছে না

বোধ হয় তার বয়সের জন্য। একটি ছেলে-পিলে হ'লে হয়ত পারত। স্বামীর প্রৌঢ়ত্বের উপর যদি এত বিরূপতা তবে রেবা তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল কেন? আগে বোধ হয় বুঝতে পারেনি। নিজের মন; ভেবেছিল সব ঠিক হয়ে যাবে; কিন্তু এখন বোধ হয় দেখছে যে, কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না তাঁর প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে। এ নিয়ে রেবাকে কোন প্রশ্ন করা চলে না। শুধু এ নিয়ে কেন, কিছু একটা সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করতে গেলেই তার মুখ-চোখে একটা শঙ্কাকুল ভাব ফুটে ওঠে। অসহ্য লাগে বোসসাহেবের কাছে রেবার এই চাউনিটা। এর চেয়ে এমিলির স্বভাবের ভাল দিকটার স্মৃতি রোমন্থন করে বাকি জীবনটুকু কাটানোই ছিল ভাল। ভেবেছিলেন বিয়ে করে অশান্ত মন শান্ত হবে, কিন্তু এই পেয়ে-না-পাওয়ার যন্ত্রণার হাত থেকে যে মুহূর্তের জন্যও নিস্তার নাই। ভোলবার জন্য আবার মদ ধরলেন বোসসাহেব।

স্বামীর মতিগতির পরিবর্তন দেখে রেবা ভয় পায়। একটা পরামর্শ করবার পর্যন্ত লোক নাই এ-বাড়িতে। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের তফাত বেশী হবার সঙ্কোচে সে কোন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ইচ্ছা করেই করেনি। মাকে এসব কথা লিখতে বাধে। কারও কাছে বলতে পারলে বোধ হয় নিজের বুকের বোঝা হাল্কা হত, একটি ছেলেপিলে হলে হয়ত স্বামীর টান বাড়ত; কিন্তু ভগবান দিলেন কই!

রেবা জানে, কোথায় তার দুর্বলতা—কেন সে স্বামীর মন পাচ্ছে না। তাঁর পিঁড়ি পেতে বসে খাওয়ার শখ মিটতে দেখেই সে বুঝেছে। একনাগাড়ে বাইশ বছর এমিলি-মেমের সঙ্গে ঘর করে তাঁর মেজাজ হয়ে গিয়েছে সাহেবী; জোর করে নিজেকে অন্যরকম দেখাবার চেষ্টা দিনকয়েক ছিল, এখন সে ঝোঁক ক্রমে ক্রমে কেটে যাচ্ছে। এমিলি-মেমের মত না হতে পারলে ওঁর মন পাওয়া যাবে না এই হ'ল তার বদ্ধমূল ধারণা। সে বাবুর্চির কাছে নূতন নূতন বিলাতী খানা রান্না করা শিখতে লাগল; সুক্ত, ডাঁটা-চচ্চড়ি রাঁধবার পাট তুলে দিল; রামকৃষ্ণ-ঠাকুরের ছবি দেয়াল থেকে খুলে নিয়ে নিজের স্যুটকেসে রাখাল; করল আরও অনেক কিছু এমিলি-মেমের মত হবার জন্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। মদের মাত্রা দিন দিনই বাড়ছে। কলেজে থাকতে

আরম্ভ করেছেন বোসসাহেব আগের চেয়ে বেশীক্ষণ ; সকালে যান, সন্ধ্যার সময় ফেরেন। দুপুরের খাবার পাঠিয়ে দিতে হয় সেখানে!

কলেজে বেশী সময় কাটাবার কারণ রেবা যা-ই ভাবুক, তাঁর সহকর্মীরা বলে যে, বোসসাহেব আবার পূর্ণ উদ্যমে গবেষণার কাজ আরম্ভ করেছেন। মদের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে কাজের মাত্রাও বাড়িয়েছেন। এবারকার গবেষণার বিষয় গবাদি পশুর কৃত্রিম-প্রজনন সম্পর্কিত। ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন আর মদ খান। বাড়ি ফেরবার পর তো কথাই নাই।

একটা কথা বলি বলি করেও স্বামীকে বলতে পারছিল না দিনকয়েক থেকে। সেদিন বোসসাহেব সন্ধ্যার সময় ফিরে বোতল-গ্লাস নিয়ে বসেছেন। রেবা সাহসে বুক বেঁধে তাঁর সম্মুখে গিয়ে এক নিশ্বাসে বলে ফেলল যে, ইংরেজীতে কথাবার্তা বলা শেখাবার জন্য একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষয়িত্রীর তার দরকার।

কোন্ মেজাজে ছিলেন তখন বোসসাহেব তিনি জানেন। চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে উঠলেন—"Shut up!" এরকমভাবে স্ত্রীকে তিনি কখন এর আগে তাড়া দেননি। রেবা চলে এল সেখান থেকে ; চোখ ফেটে জল আসছে তার। বোসসাহেব আর এক পেগ ঢেলে নিলেন বোতল থেকে ; এবার আর সোডা মেশালেন না।

এ-এক নতুন অভিজ্ঞতা রেবার। শুনে আসছে বটে বেয়ারার কাছে যে, দু' পেগের পরই সাহেবের মেজাজ সপ্তমে চড়ে ; তাই ও-সময় পারতপক্ষে বেয়ারা তাঁর সম্মুখে যায় না। আরও শুনেছিল যে, একটু বেশী পেটে পড়লেই সব গন্ধ সাহেবের নাকে উগ্র লাগে। আগেকার মেমসাহেবের হাস্নাহেনার গাছ একবার রাত্রিতে কাটতে গিয়েছিলেন ; তাই নিয়ে সাহেব-মেমে কী কাণ্ড সেদিন! গালাগালি, মারামারি। ইংরেজীতে গালাগালি। সাহেব প্রথমে আরম্ভ করেন শুয়োর-কা-বাচ্চা দিয়ে। তারপর চলে ইংরেজী। ওই ভয়েই সে সাহেবের সম্মুখে যায় না তখন নেহাত বাধ্য না হলে।......

এসব গল্প শুনেও ঠিক বিশ্বাস করত না রেবা আগে। ভাবত যে, বেয়ারা বাড়িয়ে বলছে আসর জমাবার জন্য। এখনও সে বিশ্বাস করে না। তবে এ কথা ঠিক যে, রাগের মাথায় স্বামী নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছেন, ওই

'shut up' কথাটার মধ্যে দিয়ে। মান-অভিমান করে বসে থাকলে তার চলবে না। মনের অবস্থা স্বামীর যে এতদূর বদলে গিয়েছে এরই মধ্যে, সে কথা সে আন্দাজ করতে পারেনি। তার কোন সন্দেহ নেই যে, মেমসাহেবের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছেন স্বামী, আর তাঁর মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। অনেক কিছু সে করতে পারত এতদিনে স্বামীর মনের মত হবার জন্য ; কিন্তু বোকার মত গড়িমসি করে এমিলি-মেমের আদব-কায়দা শিখতে দেরী করে ফেলেছে সে ; মেমের গায়ের রঙ সে না পাক, টুপি গাউন সে পরতে পারত ইচ্ছা করলে ; বমি এলেও অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়া অভ্যাস করতে পারত হয়ত ; গা ঘিনঘিন করলেও ট্রিক্সি কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে পারত ; মার কাছে চিঠি লিখে জানতে পারত যে, স্বামীর মনের মত হবার জন্য সিঁথিতে সিঁদুর না দিলে চলে কি না। আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কী করা উচিত, কে তাকে পথ দেখাবে! স্যুটকেস খুলে সে ঠাকুরকে প্রণাম করল কাঁদতে কাঁদতে। মেমরা হাতে চুড়ি পরে না ; সে হাতের চুড়ি, বালা, গলার হার খুলে ফেলে। কানের দুল হয়ত রাখা চলে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। স্নানের আগে গায়ে সরষের তেল মাখা তার অভ্যাস। কী ভুলই সে করেছে বাথরুমে স্বামীর চোখের সম্মুখে এতদিন সরষের তেলের বাটিটা রেখে! ছুটে গিয়ে সে বাথরুমের জানলা দিয়ে তেলের বাটিটা ফেলে দিল বাইরে। মেমসাহেব হ'তে গেলে তার সাজ-সরঞ্জাম কিছু কেনবার দরকার। গুছিয়ে সেসব জিনিসের একটা 'লিস্ট' করা উচিত আগে। ফর্দ করতে বসে দেখল, বর্তমান মানসিক অবস্থায় কোন জিনিসের নাম মনে আসছে না। মেমসাহেবদের মত পোশাক পয়সা দিলেও এ-শহরে এখনই পাওয়া সম্ভব নয়। 'লিস্ট' করতে বসে বারবার নজর পড়ছিল ফড়িংয়ের পিছনে ধাবমান ট্রিক্সির উপর। রেবা উঠল কুকুরটাকে এমিলি-মেমের মত জড়িয়ে ধরে আদর করতে। হাত বাড়াতেই ট্রিক্সি রুখে দাঁড়িয়ে গর্-র্ করে একটা আওয়াজ বার করল গলা দিয়ে। ভয়ে পিছিয়ে এল সে।

খানসামা খাওয়ার জন্য ডাকতে এসেছে। সাহেব বলেছেন খাবেন না রাত্রিতে ; মেমসাহেব এখন খেতে যাবেন নাকি ? রেবা বলে দিল—সে-ও খাবে না ; শরীরটা ভাল নেই।

এরা তাকে মেমসাহেব বলে ডাকে। মেমসাহেব, না ছাই! কুকুরেরও অধম হয়ে গিয়েছে সে এ-বাড়িতে! নটা বাজল, দশটা বাজল ঘড়িতে। ভেবে কিছু কূল-কিনারা পাওয়া যায় না! বেয়ারা, বাবুর্চি বাইরে যাচ্ছে; প্রায় এগারোটা হ'ল। বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে আসবার সময় দেখল, শোবার ঘরে নীল আলোটা এখনও জ্বলেনি। তার মানে তিনি এখনও শোননি। এখনও ওই বিষ গিলছেন নাকি? স্বামীর উপর রাগ-অভিমান করে থাকলে তার চলবে না। এবার শোবার ঘরে যেতে হয়!

এই সময় হঠাৎ খেয়াল হ'ল একটা কথা।......একবার করে দেখলে হয়; কিন্তু যদি হিতে বিপরীত হয়! যদি পরের জিনিস ব্যবহার করতে দেখে স্বামী আরও চটে ওঠেন! ভয়ে বুক দুরদুর করে। কিন্তু যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তার চেয়ে আর বেশী খারাপ কী হ'তে পারে!

মনের সমস্ত বল সঞ্চয় করে সে এমিলি-মেমের জিনিসপত্রে ঠাসা আলমারিটা খোলে। রাতে শোবার সময়ের- একটা পোশাক সে বার করল আলমারি থেকে। শাড়ি ছেড়ে সেগুলোকে পরে একবার আয়নায় দেখে নিল নিজেকে। দেখতে মেম-মেম লাগছে ঠিকই। এমিলি-মেমের পাউডারের গন্ধ এখনও নষ্ট হয়নি। তা-ই কৌটো থেকে নিয়ে খানিকটা লাগাল মুখে। মেমসাহেবের ব্যবহার করা একটুকরো লিপষ্টিক পড়ে রয়েছে এক কোণায়। রাতে ও-জিনিস মেমসাহেবরা লাগায় কিনা ঠিক জানা নেই। সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সেটাকে একটু ঘষে নিল ঠোঁটে। মেমসাহেবের ব্যবহার করা লিপষ্টিক ঘষবার সময় বড় ঘেন্না ঘেন্না করছিল তার। ইলেকট্রিক আলোতে ঠোঁট কালো দেখাচ্ছে আয়নায়। দেখাক গে! মেমদের ঠোঁট ওই রকমই দেখায়! এমিলি-মেম শোবার ঘরে হিল-তোলা জুতো পরত নাকি? শোবার সময় সেণ্ট লাগাত নাকি? ট্রিক্‌সি ঘরে এসে ঢুকেছে। রেবার পরনের পোশাক শুঁকছে, আর লেজ নাড়ছে। সে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল, মেমসাহেবের মত করে। ট্রিক্‌সি লেজ নাড়াচ্ছে আরও বেশী করে। এতে রেবা মনে জোর পায়। এইবার সে শোবার ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত। নীল আলোটা তো জ্বলছে না ও-ঘরে! মনে মনে ঠিক করে নিল, ঘরে ঢুকেই হাসতে হাসতে স্বামীকে কী বলবে। তিনি চোখ তুলে তাকিয়ে প্রথমটায়

বোধ হয় চিনতে পারবেন না ; বোধ হয় চমকে উঠবেন এত রাতে একজন ফিরিঙ্গী মেমকে ঘরে ঢুকতে দেখে। চিনতে পারবার পর কি বলবেন, সেইটাই হচ্ছে কথা। ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সে শোবার ঘরে ঢুকল।

এ কী কাণ্ড! স্বামী বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমচ্ছেন। মদের নেশায় জুতো জোড়া পর্যন্ত খোলা হয়নি পা থেকে। দেখে একেবারে মুষড়ে পড়ল রেবা। ভগবান তার বিরুদ্ধে! তার এত সাজ-সজ্জা, জল্পনা-কল্পনা সব বৃথা হয়ে গেল! চোখে জল আসছে তার। নিদ্রিত স্বামীর দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে। এই অবস্থায় কি ওই বিছানায় গিয়ে শুতে ইচ্ছা করে মানুষের! কিন্তু দমলে তার চলবে না। কিছু তাকে করতেই হবে। শক্ত হতে হবে। স্বামীর মন তাকে ফিরে পেতেই হবে, যেমন করে হোক!

নিদ্রিত নেশাগ্রস্ত মানুষটির নাক-মুখ দিয়ে, ঘোড়ার মত সেই ফর্‌-র্‌-র্‌ ফর্‌-র্‌-র্‌ শব্দটা বার হচ্ছে। ঘরের আলোটা নিবিয়ে নীল আলোটা জেলে দিল রেবা। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। নিজের লেপটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে দু ভাঁজ করে ঠিক খাটের পাশে মেঝেতে পাতল। বেশ পুরু গদিমত হয়েছে। সেই গদির ওপর রাখল নিজের বালিশটা! মেমসাহেবের মত হতে গেলে যে এত মনের বলের দরকার আগে বুঝতে পারেনি। হে মা কালী, শেষ মুহূর্তে আর মনের জোরটুকু কেড়ে নিও না! স্বামীর নাক-মুখের সেই শব্দটা কানে আসছে, আর ভয়ে তার বুক কাঁপছে। খাটের উপর থেকে ঝুঁকে আর একবার মেঝেটা দেখে নিল। লেপটা ঠিক জায়গায় পাতা হয়েছে। তারপর শরীর মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে, নিদ্রিত স্বামীর গুরুভার দেহটাকে সে খাট থেকে ঠেলে নীচে ফেলে দিল। ঠিক বালিশের উপর পড়েছে মাথাটা। স্বামী নেশার ঝোঁকে বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। ট্রিক্‌সির উদ্দাম চীৎকার ও দোর আঁচড়ানিতে সব কথা শোনা গেল না। রেবার কানে এল শুধু—"এমিলি তোমার গায়ে নারকোল-তেলের গন্ধ কেন?"

॥ হিসাব নিকাশ ॥

এককড়ির কোন আচরণেই বাড়ির লোকরা অবাক হয় না। তাই একটা খালি বোরা হাতে নিয়ে রাত সাড়ে দশটার সময় জামাই-বাড়ী পৌঁছতে দেখে মেয়ে আশ্চর্য হল না; শুধু হাত থেকে বোরাটাকে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে রেখে বলল "এখনই খেতে বসে যাও বাবা।" খাওয়া দাওয়ার পাট তখনও শেষ হয়নি। বেয়ানের শ্রাদ্ধ আগের দিন হয়ে গিয়েছে। সেদিন ছিল মৎস্যমুখের নেমন্তন্ন। খেতে বসেই জানিয়ে দিলেন যে, তিনি 'এদের' নিতে এসেছেন। এদের মানে স্ত্রীপুত্রকন্যাদের। তাঁরা এসেছেন দিনকয়েক আগে, বেয়ানের শ্রাদ্ধের কাজটা সামলে দেবার অজুহাতে।

ভোর সাড়ে চারটার গাড়ীতেই যেতে হবে। দেরী করবার উপায় নাই; কেন না প্রতিবেশী সিংহিবাবুদের বাড়ীতে মেয়ের বিয়ে। কালকেই। তাঁরা স্বামী স্ত্রীতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের দায় উদ্ধার না করে দিলে, দেখায় অত্যন্ত খারাপ।

এককড়ি দাসের পরোপকারের প্রবৃত্তিটা সম্পূর্ণ নির্ভেজাল নয়। একটানা কোন কাজে লেগে থাকার রুচি নাই। কাজেই পরোপকার করেই সে নিজের জীবিকা সংস্থান করে। সেইজন্য মেয়ে খালি বোরাটা ভরে দিল বেল, আলু, পাটালিগুড়, শিলনোড়া—অর্থাৎ ভাঁড়ার ঘরের যে জিনিস চোখের সম্মুখে পড়ল, তাই দিয়ে।

গাড়ী রাখা থাকে স্টেশন-ইয়ার্ডে সারা রাত। শেষরাত্রিতে এতগুলি কাচ্চাবাচ্চাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার নানান লেঠা। তাই জামাই তাঁদের তখনই তুলে দিয়ে এল গাড়ীতে। কুলির মাথা থেকে ভারী বোরাটাকে নামাবার সময় জামাই বলল "একটা বোটকা বোটকা গন্ধ পাচ্ছি যেন বোরাটা থেকে।"

শ্বশুর শুঁকে বললেন—"না তো।"

বাবলু জিজ্ঞাসা করে—"মেজদি, বোটকা কিরে ?"

বাবা তাড়া দিলেন—"হল আরম্ভ বাবলুর, এই রাত দুপুরে! শুয়ে পড়্!"

মশার কামড়ে ঘুম হয়নি সারারাত। ভোর হতেই এককড়িবাবু জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন গার্ডসাহেব আসছেন, মেমসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে। ছুটো কুলির মাথায় লটবহর। বেয়ারাটা পিছনে পিছনে আসছে হাতের টিফিন বাস্কেটটাকে অতি সন্তর্পণে আলগোছে ধরে। মেমসাহেব উঠলেন গার্ডের গাড়ীতে। গার্ডসাহেব এইবার চলেছেন চায়ের স্টলের দিকে। এককড়িবাবুও গাড়ি থেকে নেমে ছুটলেন চায়ের দোকানের দিকে।

গাড়ি এখনও না ছাড়ায় বাবলুও অস্থির হয়ে পড়েছে। গার্ডসাহেব নিশান নেড়ে বাঁশি বাজাবে, তবে তো গাড়ি ছাড়বে। সাহেব দেখলেই তার ভয় ভয় করে। গার্ডসাহেব হেসে বাবার সঙ্গে কথা বলছে চায়ের দোকানে। বাবা সায়েব দেখে একটুও ভয় পায় না। সায়েব দোকানদারকে কি যেন বলছে। দোকানদার সায়েবকে চা দিল মাটির খুরিতে, আর বাবাকে দিল কাপে করে। বাবাকে দোকানদার সায়েবের চেয়েও বেশী ভয় করে। বাবা পকেট থেকে পয়সা বার করে দিতে যাচ্ছে, সায়েব দিতে দিল না। সায়েব খুরিতে চা নিয়ে চলে গেল। বাবা বাসিমুখে চা খাচ্ছে। বাবার মতন অত গরম চা আর কেউ খেতে পারবে না; সায়েবও পারবে না; এন্‌জিন্-ড্রাইভারও পারবে না। বাড়িতে তাদের চা হয় না; বাবা চা খায় অন্য লোকের বাড়িতে।

বাবা গাড়িতে ফিরতেই বাবলু জিজ্ঞাসা করে—"বাবা, সায়েবরা খুরিতে করে চা খায়?"

"না।"

"ওই যে নিয়ে গেল।"

"ও নিয়ে গেল দুধ।"

"সায়েবরা খুরিতে করে দুধ খায়?"

"চুপ করে বস্! দেখছিস না গাড়িতে কত লোক উঠছে!"

সত্যিই গাড়ি একেবারে লোকে ভরে গিয়েছে ট্রেন ছাড়বার আগে। এককড়িবাবুর স্ত্রীর কোলে খুকু কাঁদছে। দীপি আর মিনা ঘুমচ্ছে। তারপর

বসেছে বাবলু। তারপর বসেছে বাবলুর মেজদি আর সেজদি। অন্য যাত্রীরা দেখা গেল প্রায় সকলেই সকলের চেনা। একজন বললেন 'চারটে পঁয়ত্রিশ তো হল।'

"হ্যাঁ, কারেক্ট টাইমে-এই ছাড়বে; গার্ডসাহেবের নিজেরই চাড় আছে আজ।"

"কেন, মেমসাহেব সঙ্গে আছে বলে?"

"হ্যাঁ। দেড় বছর পর মিসেজ রবার্টসন ফিরে এসেছে টি বি স্যানেটোরিয়াম থেকে।"

"আজকাল আর টি বি-তে লোক মরে না। বেশ স্বাস্থ্য হয়েছে মেমসাহেবের।"

"হ্যাঁ। কাল রাত্রিতে যদি দেখতে রবার্টসনকে। একেবারে আনন্দে ডগমগ, প্ল্যাটফর্মে মেমসহেবকে দেখে।"

গাড়ির ঘণ্টা পড়ায় এদের গল্পে বাধা পড়ল। এককড়িবাবুর মুখের উদ্বেগের ভাবটা যেন একটু কাটল। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—"এরা সব রেলে কাজ করে।"

গাড়ি ছাড়ায়, বাবলুর গল্পের উৎসাহ বাড়ে।

"টেলিগ্রাফের তার ছুঁলে মানুষ মরে যায়, তবে পাখীরা মরে না কেন মেজদি?"

"পাখীরা যে পাখী, আর মানুষরা যে মানুষ।"

"ও।"

বাবলু জানত, কিন্তু ভুলে গিয়েছিল।

"ওগুলো অমন সার বেঁধে বসেছে কেন মেজদি?"

"নেমন্তন্ন খেতে বসেছে বোধহয়।"

"ধেৎ! পাখীরা আবার নেমন্তন্ন খায় নাকি।"

"আমরা নেমন্তন্ন খাব আজ, আর পাখীরা খাবে না?"

"পাখীরা যে পাখী।"

"তা হলই বা।"

"আমরা কাল খেয়েছি নেমন্তন্ন, পরশু খেয়েছি নেমন্তন্ন। পাখীরা খেয়েছিল?"

"জানি না যা !"

মেজদি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসল। বাবলুর দরকার কথা বলবার লোকের।

"এই দীপি ওঠ্। আর চারটে ইস্টিশান পরেই রাধানগরে পৌঁছে যাবে গাড়ি, এখনও ঘুমুচ্চে।"

মা তাড়া দিলেন—"ও কি হচ্ছে বাবলু! ও ঘুমুচ্ছে, ওকে চিমটি কাটছিস কেন ?"

"রাধানগরে ওদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে, নামাতে নামাতে যদি গাড়ি ছেড়ে যায় ?"

"তোকে সর্দারি করতে হবে না। এখনই উঠে আবার খাওয়ার জন্য চেঁচামেচি আরম্ভ করে দেবে।"

"আমি মা লেডিকেনি খাব।"

বাঙ্কের উপর হাঁড়িতে মেয়ের দেওয়া লেডিকেনি রয়েছে; সেইটাই বাবলুর লক্ষ্য।

"ওখানে গিয়েই তো নেমন্তন্ন বাড়িতে কত কি খাবি। এখন হ্যাংলাপনা করিস না একগাড়ি লোকের মধ্যে !"

বাবা বকে উঠলেন—"বাবলু, হচ্ছে কী। মুখ না ধুয়ে খায় না কি লোকে ?"

"তুমি তো মুখ না ধুয়ে চা খেলে।"

"ওকি নিজে থেকে খাওয়া নাকি; সাহেব খাওয়াল, তাই খেতে হল।"

"ও।"

বড়দের যুক্তি বাবলু ঠিক বুঝতে পারে না। তবু ভাব দেখায় যেন বুঝেছে। তার এখন ইচ্ছা করছে খাওয়ার গল্প করতে।

"সেখানে পৌঁছেই আমরা বিয়ে বাড়ি যাব, না ?"

"স্নান করে তবে তো যাবি।"

"জলখাবার খাব বিয়ে বাড়িতে গিয়ে—না ?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর দুপুরবেলা নেমন্তন্ন খাব, রাত্রিতে নেমন্তন্ন খাব।"

"হ্যাঁ। তবে কাজ করতে হবে কিন্তু বিয়েবাড়িতে।"

"কী কাজ ?"

"কাক তাড়াবি ; জুতো পাহারা দিবি।"

"ধুৎ! দীপি, মিনা, খুকু এরা কিন্তু কাজ না করেই নেমন্তন্ন খাবে।"

"ওরা যে একেবারে বাচ্চা। দেখিস না ওদের টিকিট লাগে না ট্রেনে।"

"আমার টিকিট লাগে ?"

"হ্যাঁ, হাফ-টিকিট। তোর হাফ-টিকিট, সেজদির হাফ-টিকিট, মেজদির হাফ-টিকিট।"

একটা স্টেশনে গাড়ি থামায়, বাবলুর মনোযোগ অন্যদিকে গেল। জানলা দিয়ে সে প্ল্যাটফর্ম দেখছে।

"মেজদি! মেজদি! ওই ত্যাখ মেমসাহেব। গার্ডের গাড়ির কাছে। ওর কোলে একটা কালো বিড়াল রয়েছে।"

"ফের যদি জানলা দিয়ে ঝুঁকেছ, তাহলে দেবো কান ছিঁড়ে!"

এককড়িবাবু বাবলুকে টেনে ধরে সোজা করে বসিয়ে দিলেন বেঞ্চের উপর। তারপর সম্মুখের বেঞ্চের খবরের কাগজ পাঠরত ভদ্রলোকটির দিকে হাত বাড়ালেন।

"দেখি দাদা একখানা পাতা। হাঁ্যা আসল পাতাখানাই হাতে এসেছে ঠিক।"

"কোনখান ? ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর খুব বিশ্বাস বুঝি মশায়ের ?"

"বিশ্বাস! বিশ্বাস বলছেন ? হুবহু মিলে যায়। আমার নিজের জন্মের রাশিটা ঠিক জানা ছিল না আগে। একদিন একখানা পুরনো কাগজ নাড়াচাড়া করতে করতে দেখি, মিথুনরাশির ফলাফল আমার সেই সপ্তাহের জীবনের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সেই থেকে আমি ধরে নিয়েছি যে মিথুনরাশিতে আমার জন্ম। তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে মিথুনরাশির ফলাফলের সঙ্গে আমার জীবনের ঘটনাগুলোকে মিলিয়ে আসছি। একেবারে মিলে যায় মশাই। একটুও বাড়িয়ে বলছি না।"

কাগজের দিকে চোখ থাকলে কি হয়, এককড়ি কান খাড়া রেখেছে রেলের বাবুদের গল্পের দিকে। তাদের মধ্যে কি করে যেন রবার্টসনের কথা আবার উঠেছে। সেইটাই হয়েছে তার দুশ্চিন্তার বিষয়। তাদের গল্প কানে আসছে।

"মেমসাহেব স্যানেটোরিয়াম থেকে ফিরতি পথে ওখানে পৌঁছেছিল বিকালের গাড়িতে। আসবার কথা ছিল রাত বারোটার গাড়িতে; কিন্তু পৌঁছে গিয়েছিল আগেই। রবার্টসন সাড়ে নটার গাড়ি নিয়ে যখন ওখানে পৌঁছল, তখন মেমসাহেব একমুখ হাসি নিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, স্বামীকে 'রিসিভ' করবার জন্য।"……

প্রয়োজনের চেয়েও জোরে জোরে চেঁচিয়ে এককড়ি হঠাৎ সম্মুখের ভদ্রলোককে জ্যোতিষশাস্ত্র বোঝাতে লাগল।

"একেবারে অঙ্ক মশাই। জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে জালজোচ্চুরীও নেই, ধর্মকর্মও নেই, মুনিঋষিও নেই। অঙ্ক ঠিকভাবে কষো, আর পাতা উলটে উত্তর মিলিয়ে দেখে নাও; ঠিক হল কি না।"

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার এ সপ্তাহ কেমন যাবে, সে সম্বন্ধে কাগজে কী বলে?"

"শুনুন। রাজকর্মচারীরা জাতকের উপর সদয়। বন্ধুভাগ্য ভাল। সুযশ ও অর্থাগমের সম্ভাবনা।"……

"তবে তো মশাই মেরে দিয়েছেন!"

"মেজদি, বাবা কি পড়ল রে কাগজে?"

"ওসব হাত গোনার কথা। তুই বুঝবি না।"

এককড়ির চিৎকারে ছোটখুকু জেগে উঠেছে। তাই স্ত্রী চটেছেন, স্বামীর উপর। "একটু আস্তে কথা বলো না! এখানে কালা কেউ নেই।"

রেলের বাবুদের গল্প তখন বেশ সরস জায়গায় পৌঁছেচে।

"প্ল্যাটফর্মের উপর, এক হাট লোকের মধ্যে, দুজন দুজনকে জড়াজড়ি করে, রবার্টসন আর তার মেমের সে যে কী চুমো খাওয়ার ঘটা কাল রাত্রিতে।"…

এককড়ি তাড়া দিয়ে উঠল—"গাড়িতে মেয়েছেলে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন না! কী রকম ভদ্রলোক মশাই আপনারা?"

"কেন, কী অভদ্রতা করলাম আমরা?"

"নিজের মা-বোনের সম্মুখে আপনারা এই সব অশ্লীল কথা বলেন?"

"আমরা গল্প করছি নিজেদের মধ্যে, সে কথা আপনাদের কান খাড়া করে শোনবারই দরকার কি।"

"চোখের পাতা যখন ইচ্ছা বোঁজা যায়, কিন্তু কান ইচ্ছামত বন্ধ করবার কোন ব্যবস্থা যে ভগবান করে দেন নি।"

"এত যাঁদের শুচিবাই তাঁরা পুরুষদের গাড়িতে মেয়েছেলেদের ওঠান কেন?"

"রেলে কাজ করেন কিনা; তাই ভাবেন গোটা রেলগাড়িখানাই আপনাদের। জেন্টুইন্ প্যাসেঞ্জারদের সুবিধা দেখবেন কেন আপনারা।"

"দেখুন অনর্থক গায়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসবেন না। হ্যাঁ, তারপর যে কথা হচ্ছিল—সায়েবমেম যখন উল্লাসে আত্মহারা, ঠিক সেই সময় একজন আধপাগলা গোছের লোক চটের থলিতে একটা বিড়াল নিয়ে ওই ট্রেন থেকে নেমেছে। সবাইকে তার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতে দেখে মেম জিজ্ঞাসা করে—ওখানে গোলমাল কিসের, ডিয়ার? পাগলা লোকটা জানাল যে, কালো বিড়াল বড় অমঙ্গুলে বলে সেটাকে সে এখানে ছেড়ে দেবার জন্য নিয়ে এসেছে। সাহেব তো অবাক। কালো বিড়াল অমঙ্গুলে? কে বলে? ওই বিড়ালটা আমার ট্রেনে ছিল বলেই প্রত্যাশিত সময়ের আগে আমি মেমসাহেবের দেখা পেয়েছি। মিসেজ রবার্টসন বলল—বিড়ালটাকে আমি পুষব, ডিয়ার। লোকটা চটের থলেটা দিতে কিছুতেই রাজী হল না। অতি কষ্টে বিড়ালটাকে ঢোকান হল মেমসাহেবের টিফিন বাস্কেটে।"

বাবলু ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে—"কি হয়েছিল রে মেজদি কালো বিড়ালের?"

"ওসব অসভ্য কথা শুনিস না।"

বাবলু জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে সুস্থির হয়ে বসল। কালো বিড়ালের খবরটা জানবার জন্য তার খুব ইচ্ছা করছে; তাই সে কান পেতে আছে অসভ্য কথার দিকে।

সমর্থন পাবার আশায় এককড়ি সম্মুখের ভদ্রলোককে বলে—'সবাই 'কম্‌প্লেন্' করে যে ভিড়ের ঠেলায় রেলগাড়ীতে ওঠা যায় না। আরে ভিড় কমবে কোথা থেকে। প্যাসেঞ্জারদের শতকরা নিরানব্বই জনই যে রেলে কাজ করে। সব 'ফ্রি' পাসের দল।"

ভদ্রলোকটি কাগজের পাতা থেকে মুখ সরালেন না।

একজন টিকিটচেকার এসে ঢুকেছেন বাড়িতে। বাবলুর সাহেব দেখলে ভয় করে, পুলিস দেখলে ভয় করে। আর রেলগাড়িতে টিকিটচেকার দেখলে ভয় করে। এঞ্জিনড্রাইভারের চেয়েও সাহস বেশী টিকিটচেকারদের। ডাকাতসর্দারের মত অন্ধকার রাত্রিতে তারা একগাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে যেতে পারে। চেকার টিকিট ফুটো করবার সাঁড়াশিটা বাবার মুখের সম্মুখে ধরেছে, ঠিক ডাকাতসর্দাররা যেমন করে পিস্তল ধরে। বাবা টিকিট দেখাচ্ছে। দীপি, মিন, খুকু কারও টিকিট নাই। যদি ওদের ধরে নিয়ে যায়, তাহলে কি হবে! ভয়ে বুক টিপ টিপ করে বাবলুর।

এককড়ি খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলে, অতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে টিকিটগুলোকে দিল চেকারের হাতে।

"আপনারা কজন?"

"এই যে কজনকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে।"

"টিকিট দিলেন তো সাড়ে তিনখান।"

"হ্যাঁ দুখান ফুল্ আর হাফ্ তিনখান।"

"আর একখান হাফ্ টিকিটের দরকার হচ্ছে যে। ছোট দুটির না হয় লাগবে না।"

"না, ওরও লাগবে না। ওর বয়স দুবছর চার মাস।"

"দেখুন আমরাও মশাই পুত্রপরিবার নিয়ে ঘর করি; গেরস্তর দুঃখদরদ বুঝি। অন্যদিন হলে ছেড়ে দিতে পারতাম। আজ উপায় নেই। আজ রাধানগরে magisterial checking হবে, খবর পেয়েছি। নিজের চাকরিটা তো বাঁচাতে হবে। আপনাকে মশাই আর একখান হাফ্টিকিট কিনতে হবে।"

"কেন কিনব? বলছি, বিশ্বাস করুন, ওর বয়স আড়াই বছরের নীচে। ঠিকুজি কুষ্ঠিতো এখানে দেখাতে পারি না; আমার কথাই আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে।"

"না সে হয় না।"

"হবে না কেন শুনি!"

"তিনজন ফ্রি টিকিটে যাবে, সে হয় না।"

"হয়। হয়! একশবার হয়!"

আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে এককড়ির।

"হবে না কেন। এক সঙ্গে পাঁচজনেরও জন্ম হয় পৃথিবীতে; কিন্তু সেরকম দাবি তো আপনার নেই। সাড়ে ছ'আনা পয়সার তো মামলা। এ নিয়ে কেন এত কথা বাড়াচ্ছেন?"

টিকিট-চেকারের কথাবার্তার ধরন দেখে এককড়ির মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছে। সব চেয়ে গা জ্বালা করে অন্য সব রেলের বাবুদের হাসি দেখে। সবাই মজা দেখছে! এক গাড়ি প্যাসেঞ্জার; কিন্তু সবাই টিকিট চেকারের দিকে! সবাই ধরে নিয়েছে যে সে টিকিট ফাঁকি দিতে চায়। ইডিয়টের দল!

"কথা বাড়াচ্ছি আমি, না আপনি? এ সাড়ে ছ'আনার প্রশ্ন নয়; আইনের প্রশ্ন। Rule is rule. রেলের রুল্ অনুযায়ী ওর টিকিট লাগবে না।"

"অযথা তর্ক করেন তো আমি নাচার। অতি ছোট ছেলেটাও যে কথা বোঝে, আপনি বুঝেও সে কথা না বোঝবার ভান করেছেন।"

"মুখ সামলে কথা বলবেন!"

"দেখুন এক মায়ের পেটের তিনটি মেয়ের টিকিট লাগবে না সরকারী নিয়ম অনুযায়ী —এরকম কথা ভুল, যে কচি ছেলেটা সবে কর গুনতে শিখেছে সেও ধরতে পারবে। আর নিজেই যখন স্বীকার করছেন যে, এদের মধ্যে যমজও কেউ নয়, আটাশেও কেউ নয়।"

"আমাকে অঙ্ক শেখাতে এসেছেন! তিনটে দোকানদারের ইনকাম-ট্যাক্সের খাতা লিখে দিই আমি প্রতি বছরে। কর গোনা শেখাতে এসেছেন? কোত্থেকে যে রেল কোম্পানি এই সব গবেটগুলোকে ধরে এনে চাকরি দেয় জানি না! আপনাদের একমাত্র কাজ genuine passengerদের harass করা! সব বুঝি! কেবল ঘুষ খাওয়ার মতলব।"

"সাড়ে ছ'আনার টিকিটে কত আর ঘুষ খাব। যাক, আপনি যখন টিকিট কিনতে রাজী না, তখন আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অ্যাপিয়ার হতেই হবে। ভাল কথায় বললাম, তা হল না। জরিমানা দেবার সাধ গিয়েছে, তার আর আমি কি করি।"

এককড়ির মেজাজ সপ্তমে চড়েছে। গাড়ি কখন পরের স্টেশনে থেমেছে সেকথা তার খেয়াল নাই।

"আপনাদের ওসব ম্যাজিস্ট্রেট-ফ্যাজিস্ট্রেটের তোয়াক্কা রাখে না এককড়ি দাস। দেখে নেবো আমি আপনাকে। আপনার চাকরি খাব! Simple যোগ বিয়োগও কি কোনদিন শেখেন নি?"

সে অনর্গল চীৎকার করে যাচ্ছে। গাড়ির দরজার সম্মুখে লোক জমে গিয়েছে। প্যাসেঞ্জারদের প্রত্যেকেই সমর্থন করছে টিকিটচেকারকে। কেউ কেউ সন্দেহ করছে লোকটা হয়ত ছিটগ্রস্ত।

"বেশি গোলমাল করেন তো এখানেই নামিয়ে পুলিসে হ্যাণ্ডওভার করে দেবো।"

উঠে দাঁড়িয়েছে এককড়ি। হাতাহাতি হবার উপক্রম। কয়েকজন প্যাসেঞ্জার এসে দুজনকে আলাদা করে দিল। ছেলেমেয়েরা কাঁদছে। বাবলুর মা স্বামীকে হাত ধরে বেঞ্চিতে বসাতে চাচ্ছেন। এককড়ি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে—"আমি আপনার নামে ক্রিমিনাল্ কেস্ আনব। রেলের বিরুদ্ধে 'ড্যামেজ স্যুট' আনব। লোকসভায় প্রশ্ন করাব এ নিয়ে। ভাববেন না যে এখানেই এ ব্যাপার শেষ হল!"

ভিড় ঠেলে গার্ডসাহেব এসে গাড়িতে ঢুকলেন।

"কী ব্যাপার? কিসের গণ্ডগোল?"

"তিনটে মেয়েকে ফ্রি টিকিটে নিয়ে যেতে চান এই প্যাসেঞ্জার।"

রবার্টসন সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন, এককড়ির দিকে।

"ইউ! আপনি! আপনার দেওয়া পুসিটা দুধ খাওয়াবার পর থেকে পোষ মেনে গিয়েছে। এখন বেশ আরাম করে শুয়ে রয়েছে আমার স্ত্রীর কোলে।"

রেলের বাবুরা উপহাসে নির্দয় হয়ে উঠেছে।

"ইনিই তাহলে কাল রাত্রের তিনি!"

"ট্রান্সপোর্ট বিজনেস্ করেন।"

"অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাক্চারার্স্ আন্লিমিটেড।"

খেপে উঠেছে এককড়ি।

"সাট্ আপ! ভেবেছেন এককড়ি দাস ইংরাজী রসিকতার মানে বোঝে না! স্ত্রীপুত্র পরিবারের সম্মুখে এই সব ইন্‌ডিসেণ্ট কথা বলে আমাকে অপমান করা!"

"হ্যাঁ, জেনুইন্ প্যাসেঞ্জারকে।"

রবার্টসন সাহেব রেলের বাবুদের থামিয়ে দিয়ে, টিকিট-চেকারকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কত দিতে হবে?" পকেট থেকে পয়সা বার করছেন দেখে এককড়ি হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে।

"আমি ভিখিরী নই। কারও দানের প্রত্যাশী নই। আমি শুধু চাই রেলকর্মচারীরা, গভর্নমেণ্টের তয়ের করা নিয়ম মেনে চলুক!"

"তবে যা মন চায় করুন।"

গার্ডসাহেব চলে গেলেন।

গাড়ি ছেড়েছে। এর পরের স্টেশনই রাধানগর। গাড়িতে একটা থমথমে ভাব এসেছে। রেলের বাবুরা টিপ্পনী কাটা বন্ধ করেছেন। ছেলেমেয়েদের কান্না বন্ধ হয়েছে। বাবলুর মুখে পর্যন্ত কথা নাই। আসন্ন বিপদের ভয়ে ভাইবোন সকলে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। বাবলুর মা মাথা নীচু করে বসে আছেন। স্বামীর কাণ্ডতে লজ্জায় তাঁর মাথা কাটা যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে তিনি সব প্যাসেঞ্জারদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। একজন সাহস সঞ্চয় করে তাঁকে বলল—"আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন ওঁকে।"

"আপনি আমার স্ত্রীর উপরও কর্তৃত্ব ফলাতে চান দেখছি। এককড়ি দাস মেয়েমানুষের কথা শুনে চলে না।"

রাধানগর স্টেশনে যখন গাড়ি থামল তখনও এককড়ির আস্ফালন থামেনি।

"চলুন কোথায় যেতে হবে।"

ওয়েটিংরুমে কোর্ট বসেছে ম্যাজিস্ট্রেটের। লটবহর, স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবসুদ্ধ এককড়িকে হাজির করা হল তাঁর সম্মুখে। লোকে লোকারণ্য!

ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি সাড়ে ছ'আনা দিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন?

"আপনিও সার এই কথা বলছেন! টিকিটচেকারটা আপনাকেও হিপ্‌নটাইজ্ করল নাকি?"

"সাবধানে কথাবার্তা বলবেন এখানে। এটা কোর্ট। অন্যায় করেছেন, কোথায় লজ্জিত হবেন, তা নয় আবার উদ্ধতভাবে কথা বলছেন।"

"লজ্জিত হবার মত কিছু আমি করিনি। রেলের নিয়ম অনুযায়ীই আমি আমার ছোট মেয়ে তিনটিকে নিয়ে যাচ্ছি বিনা টিকিটে।"

"তা হলে দেখান সে রুল্ আমায়।"

"রুল দেখাবার দরকার নেই। শুধ্ যোগবিয়োগ জানলেই হবে। ওই তিনটির মধ্যে বড়টির বয়স ত্ব'বছর চার মাস। ওর কি টিকিট লাগবে?"

"ওর বয়সটাতো আমরা অবিশ্বাস করছি। আপনার তিনটি সন্তান ফ্রি টিকিটে যেতে পারে না। সম্ভব অসম্ভব বলেও তো একটা জিনিস আছে।"

"অসম্ভব? একটি সন্তান মায়ের পেটে থাকে কতদিন? দশ মাস?

"দশ মাস কেন, আমি আরও কমিয়ে দিচ্ছি। Period of gestation ২৭৩ থেকে ২৮০ দিন পর্যন্ত হতে পারে অর্থাৎ ধরুন ন'মাস তিনদিন।"

"আমি কন্‌শেসন্ চাচ্ছি না সার—দশমাসই আপনি রাখুন। একজনের বয়স যদি দুই বছর চার মাস হয় এবং তার পরেরটি যদি এক বছর পর জন্মায়, তাহলে তার বয়স হয় এক বছর চার মাস। কেমন কিনা? আর আমার ছোট মেয়েটি আঁতুড়ঘর থেকে বেরিয়েছে মাসখানেক আগে। বিশ্বাস না হয়, ওর মাকে জিজ্ঞাসা করুন। এর মধ্যে সম্ভব অসম্ভবের কথা কি করে আসছে? সোজা হিসাব। অথচ লোকে গুলিয়ে ফেলেছে। জালজোচ্চুরী দেখতে দেখতে লোকের এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, সার, যে যেই দেখল তিনটি মেয়েকে বিনাটিকিটে নিয়ে যাচ্ছে, অমনি ধরে নিল যে নিশ্চয়ই ফাঁকি দিচ্ছে লোকটা। লোকে বলল কাকে কান নিয়ে গিয়েছে, অমনি তার পেছু পেছু ছোটো। আপনি তো তবু আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনলেন; চেকারবাবুর সে সময় কোথায়! আর প্যাসেঞ্জারদের কথা বাদ দেন। একজন যেই বললে, চোর অমনি সবাই চেঁচাল 'ধর! ধর!'—সবাই মিলে আমায় হেসেই উড়িয়ে দিল সার।"

ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব চেকারকে তাড়া দিলেন অনর্থক জেনুইন প্যাসেঞ্জারকে কষ্ট দেবার জন্য।

"ঠিক আছে সার। আমি চেকারের বিরুদ্ধে ড্যামেজ্ স্যুট আনব, আর আপনাকে সে কেসে সাক্ষী মানবো, বলে রাখলাম। এখন আমার একটু বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে। এই কুলি! মাল ওঠাও!"

দোরগোড়াতেই মিস্টার আর মিসেজ রবার্টসন দাঁড়িয়ে। গলায় রিবনবাঁধা একটা কালো বিড়াল মেমসাহেবের কোলে। জটিল বিষয়কে সরল করবার অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন এই funny বাবুটির সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য সাহেবমেম দুইজনেই হাত বাড়ালেন। কী হল ঠিক বলা যায় না; কুলির মাথার প্রকাণ্ড বস্তাটার গন্ধ পেয়ে, কিংবা এককড়ি তাকে আবার ধরতে আসছে ভেবে, বিড়ালটা লাফ মেরে ম্যাজিস্ট্রেটের টেবিলের উপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরবার পথে বাবলু মেজদিকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল—"বাবা অঙ্কে ফার্স্ট—নারে?"

"হ্যাঁ"

"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেকেণ্ড?"

"হ্যাঁ"

"গার্ডসাহেব থার্ড?"

"হ্যাঁ"

"আর টিকিটচেকার লাস্ট্।"

বাবলুর মা এতক্ষণে মুখ খুললেন।

"কাঁধে করে বিড়াল বয়ে নিয়ে যাবার হুজুগ আবার উঠেছিল কেন তোমার? মাথা খারাপ হল না কী!"

"আরে তুমিও যেমন! বিয়েবাড়িতে বিড়ালটা পরিত্রাহি চিৎকার করছিল। বাড়ির গিন্নী বললেন, কালো বিড়ালের ডাক বিয়ে বাড়িতে অমঙ্গল ডেকে আনে। আর যাবে কোথায়। সিংহিবাবুকে তো জানই। তখনই হুকুম হয়ে গেল, যে ওটাকে ধরে দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসতে পারবে তাকে দশটাকা দেবেন তিনি। বিড়াল ধরা কি যে সে লোকের কম্ম। শেষ পর্যন্ত সেটাকে ধরল সিংহিবাবুর নেপালী দারোয়ান। নেপালী বলেই পেরেছিল। তখন মালিকের মনে পড়ল যে, বিয়েবাড়ির গেট ছেড়ে

দারোয়ানের কিছুতেই বাইরে যাওয়া উচিত না। কাজেই আমাকেই নিতে হল ওটাকে দূরে ফেলে আসবার ভার।"

"কেন, আর কি পৃথিবীতে লোক ছিল না তুমি ছাড়া?"

"লোকের অভাব কি পৃথিবীতে; অভাব হচ্ছে টাকা পয়সার। নেপালীটার সঙ্গে দরকষাকষির পর ঠিক হল—সে পাবে ওটাকে ধরবার জন্য চার টাকা আর আমি পাব রাহা খরচ ছাড়া ওটাকে ফেলে আসবার জন্য চার টাকা। আমি ভাবলাম তোমাদের জামাইবাড়ী থেকে আনবার খরচটাও উঠে যাবে, শ্রাদ্ধবাড়িতেও একবার হাজির দেওয়া হবে; তারপর বিয়েবাড়িতেও বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে দিনকয়েক বেশ······"

কথাটাকে আর শেষ করল না এককড়ি। মুখ দেখে বুঝলো যে গিন্নী বুঝে গিয়েছেন, শেষ করবার আগেই। তারপর এককড়ি হিসাব খতিয়ে নিল মনে মনে।

যাবার সময়ের রেল ভাড়া—তেরো আনা, ওখানকার কুলিভাড়া দিয়ে দিয়েছে জামাই। ওখান থেকে আসবার রেলভাড়া—দুইটাকা সাড়ে তেরো আনা।

রাধানগরে কুলিভাড়া—তিন আনা।

স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরবার গাড়িভাড়া—একটাকা।

মোট খরচ—চার টাকা তেরো আনা।

বাঁচল—এক টাকা তিন আনা। আর জামাইবাড়িতে চটের বোরাটা নিয়ে গিয়ে ঠিকই করেছিল সে। তার হিসাবে কোথাও ভুল হয়নি। যা করেন শ্রীহরি।

গিন্নী বললেন—"ওই নোংরা বোরার জিনিসপত্রগুলোকে কিন্তু আমি না ধুয়ে ঘরে তুলতে দেবো না। ওটা থাক আজকে উঠনে পড়ে। এখনই বিয়েবাড়িতে যেতে হবে। ধোয়াধুয়ি করবার, সময় হবে না এখন।"

গাড়ি থেকে নেমে সবে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছেন; বাইরে হুঙ্কার শোনা গেল। সিংহিদের বাড়ির নেপালী দরোয়ান। ছুটতে ছুটতে এসেছে বলে হাঁপাচ্ছে। চক্ষুরক্তবর্ণ; ভোজালির খাপে হাত। কোথায় বেইমান এককড়িবাবু টাকার বখরা নিয়েছে, অথচ তার মনিবের কাজ করে দেয়নি! বিয়ে-

বাড়িতে হুলস্থুল কাণ্ড বেধেছে। মনিব চটে লাল। মাইজীরা কাঁদছে। কালো বিড়ালটা এখনই ফিরে এসেছে, সেই বিদঘুটে ডাকটা মুখে নিয়ে।......

দড়াম করে সদর দরজার খিল এঁটে দিল এককড়ি, নেপালীটার মুখের উপর।

কুয়োতলা থেকে বাবলুর গলা শোনা যাচ্ছে।

"বাবা হাত গোনায় ফাস্ট্ নারে মেজদি? আর মা সেকেণ্ড?"